বর্ষ ১
সংখ্যা ৪
সেপ্টেম্বর ২০১৩
৮ পৃষ্ঠা
শুভেচ্ছা মূল্য ১০ টাকা

বাংলাদেশের একমাত্র প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক পত্রিকা

অপরাজেয়

পরিবর্তনের চেতনায়

বৈষম্য ও নির্যাতনে প্রতিবন্ধী নারীর দিন যাপন পৃষ্ঠা- ৩
প্রতিবন্ধী ব্যক্তির উপর নির্যাতন প্রতিরোধ ও প্রতিকার পৃষ্ঠা- ৪
স্টেম সেল গবেষণা : মেরুদন্ডে আঘাতপ্রাপ্ত রোগীদের জন্য আশার আলো পৃষ্ঠা- ৫
অনুপ্রেরণার অন্য নাম শিউলী সাথী পৃষ্ঠা- ৬

অনিশ্চয়তার পথে প্রতিবন্ধী অধিদফতর

প্রধান প্রতিবেদন

সরকারের রাজনৈতিক অঙ্গীকার বারংবার ঘোষিত হলেও আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় এবং প্রতিবন্ধিতা নিয়ে কর্মরত এনজিও নেতৃবৃন্দের বিরোধীতায় প্রতিবন্ধী অধিদফতর গঠন অনিশ্চয়তার সম্মুখীন।

২০১০ সালে ২ এপ্রিল জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস ও বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রতিবন্ধী মানুষের অধিকার ও উন্নয়নে স্বতন্ত্র অধিদফতর গঠনের ঘোষণা দেন। এর ধারাবাহিকতায় ২০১০ সালের আগস্ট মাসে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনকে প্রতিবন্ধী অধিদফতরে রূপান্তরিত করতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সাংগঠনিক কাঠামোগত অনুমোদন দেয়। পরবর্তীতে এই অধিদফতর গঠন কার্যক্রম অর্থ মন্ত্রণালয়ের আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় মুখ থুবড়ে পড়ে। চলতি বছরে ২ এপ্রিল বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবসে প্রধানমন্ত্রী এই অধিদফতর গঠনের পুর্নঅঙ্গীকার ব্যক্ত করার পর অর্থ মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া সচল হয়।

> পূর্নাঙ্গ অধিদফতর বাস্তবায়িত হলে প্রতিবন্ধিতা নিয়ে কর্মরত এনজিওসমূহের তুলনায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠনসমূহ তাদের উন্নয়নে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অধিকতর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে

বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায়, ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বাজেট বক্তব্যে অর্থমন্ত্রী অধিদফতর গঠন বিষয়টি উল্লেখ করলে অর্থ মন্ত্রণালয় ইতিবাচক ভূমিকা নেয়। তবে সম্প্রতি এই ব্যাপারে অর্থ মন্ত্রণালয় অনুমোদন দেয়। আবারও প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির অনুমোদনের অপেক্ষায় অধিদফতর গঠনের কার্যক্রম। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিবের সাথে যোগাযোগের অনেক চেষ্টা করেও এ বিষয়ে কিছু জানতে পারে নি এই প্রতিবেদক। তবে এ বিষয়ে জানার জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের ডেপুটি সেক্রেটারি নুসরাত জেবিনের কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, এটি প্রক্রিয়াধীন আছে তবে বিষয়টি সময় সাপেক্ষ।

প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার পরেও বাধাটা কোথায় তা তলিয়ে দেখতে গিয়ে জানা যায়, এই অধিদফতর গঠন প্রক্রিয়ার শুরু থেকে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের পরিচালনা বোর্ডের এনজিও প্রতিনিধিরা বিরোধীতা করেন। জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনকে প্রতিবন্ধী অধিদফতরে রূপান্তরিত করা হলে সরকারি এই প্রতিষ্ঠানে প্রতিবন্ধিতা নিয়ে কর্মরত এই এনজিও নেতৃবৃন্দের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় কোন অংশগ্রহণ বা বিশেষ অগ্রাধিকার থাকবে না। অন্যদিকে দীর্ঘদিন ধরে প্রতিবন্ধী মানুষের উন্নয়নে সরকারের উল্লে-খযোগ্য বরাদ্দ না থাকায় সরকারি কর্মকর্তারা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য বিভিন্ন দিবস উদযাপনসহ নানা কার্যক্রমে এইসব এনজিও থেকে নানা ধরনের সহায়তা পেয়ে থাকে।

ফলে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়সহ আওতাধীন প্রতিষ্ঠানের কিছু কর্মকর্তা তাদের ওপর নির্ভরশীল। এইসব কর্মকর্তাও অধিদফতরের ব্যাপারে আগ্রহী নয়। ফলে নানা ধরণের স্বার্থের বিদ্যুতা থাকায় এই ব্যাপারে কার্যকর পদক্ষেপ লক্ষ্য করা যায় না। উল্লে-খ্য, ২০১০ সালে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব জনাব কামরুন্নেছা এই চক্র ভাঙতে উদ্যোগী ছিলেন বলেই তিনি দ্রুত জনপ্রশাসনের অনুমোদনের ব্যবস্থা করেন।

এদিকে প্রতিবন্ধী অধিদফতর গঠনের যৌক্তিকতা নিয়ে একাধিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠনের নেতৃবৃন্দের জানান, জাতিসংঘে নারীর প্রতি বৈষম্য বিলোপ সনদ (সিডো) বাস্তবায়নে এবং নারী অধিকার ও উন্নয়নে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যেমন নারী অধিদফতর ও পরবর্তীতে মন্ত্রণালয় গঠিত হয়েছে। জাতিসংঘ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অধিকার সনদ (সিআরপিডি) বাস্তবায়নে এবং তাদের অধিকার ও উন্নয়নে এখন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রতিবন্ধী অধিদফতর গঠিত হচ্ছে। সিআরপিডি অনুসমর্থনের পর ভারত সরকার কয়েক বছর আগে প্রতিবন্ধী অধিদফতর গঠন করেছে। তারা জানান, প্রতিবন্ধী অধিদফতর গঠনের মাধ্যমে দেশে প্রতিবন্ধী মানুষের উন্নয়নে বাস্তবায়নকারী, তদারকি এবং আন্তঃ অধিদফতর সমন্বয়কারী স্বতন্ত্র সরকারি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে। ফলে নারী সংগঠনের মত প্রতিবন্ধী মানুষের সংগঠনগুলো তাদের মতামতে মূখ্য ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে। পূর্নাঙ্গ অধিদফতর বাস্তবায়িত হলে প্রতিবন্ধিতা নিয়ে কর্মরত এনজিওসমূহের তুলনায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠনসমূহ তাদের উন্নয়নে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অধিকতর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। অনেকটাই অকেজো হয়ে

এরপর ২য় পৃষ্ঠা

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য স্বল্প সুদে ঋণ

বাংলাদেশ ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ার্ড পিপলস সোসাইটি (বিভিআইপিএস) এর উদ্যোগে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীসহ সব ধরনের শারীরিক প্রতিবন্ধী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য স্বল্প সুদে ব্যাংক ঋণ দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম 'বাংলাদেশ ব্যাংক ফান্ড' এর নীতিমালায় পরিবর্তন এনে বর্তমান তহবিলের ৬০০ কোটি টাকার ফান্ড হতে প্রতিবন্ধী উদ্যোক্তারা নূন্যতম ১০ হাজার টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৫ লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণ পাবেন। বাংলাদেশ ব্যাংক পুনঃঅর্থায়ন প্রকল্পের আওতায় মাত্র ১০ শতাংশ (ব্যাংক রেটের সঙ্গে ৫ শতাংশ) সুদ হারে প্রতিবন্ধী উদ্যোক্তাদের ঋণ দেয়ার জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে এই নির্দেশ দিয়ে গত ১১ সেপ্টেম্বর, ২০১৩ এক প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

উল্লে-খ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের মূল ধারার অর্থনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই অ্যান্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস বিভাগ এ ব্যাপারে সার্বিক সহযোগিতা দিয়েছে। প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ

নিজস্ব প্রতিবেদক

শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিনামূল্যে প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছে অদম্য ফাউন্ডেশন। শুধু মাত্র শারীরিক, যেমন ক্রাচ, স্টিক অথবা হুইলচেয়ার ব্যবহারকারী ব্যক্তিরাই এ প্রশিক্ষণ এর সুযোগ পাবেন।

সপ্তাহে দুদিন শুক্র এবং শনিবার তিন মাস ব্যাপী এই প্রশিক্ষণটি চলবে। খুব শিগ্গিরই শুরু হতে যাওয়া প্রথম ব্যাচের প্রশিক্ষণটি হবে কল সেন্টার এর উপর। মূলত কল সেন্টারে কাজ করার দক্ষতা উন্নয়ন, কম্পিউটার চালানো এবং ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা দেয়া হবে এখানে। এছাড়াও যোগাযোগ দক্ষতা, কাজের পরিবেশ এবং সঠিক মানসিকতা, মাইক্রোসফট অফিস ইত্যাদিও শেখানো হবে। বাৎসরিক অভিজ্ঞতার জন্যে প্রশিক্ষণ পরবর্তী পনেরো দিন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষানবীশ হিসেবে কাজের সুযোগ পাবেন প্রশিক্ষণার্থীগণ। সংগঠনটির মূল লক্ষ্য শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সঠিক দক্ষতা অনুযায়ী কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিয়ে দেশীয় অর্থনীতিতে ইতিবাচক ভূমিকা রেখে দারিদ্রকে চ্যালেঞ্জ করা। বর্তমানের প্রতিযোগিতাময় চাকরীবাজারের সাথে শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মানানসই এবং যোগ্য করে তোলার লক্ষ্যেই 'স্কিল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম' এর আয়োজন করা হয়েছে।

অদম্য ফাউন্ডেশনের সভাপতি তরিকুল হক জানান, প্রবেশগম্যতা ও সহায়ক যাতায়াত ব্যবস্থার অভাবে চার দেয়ালে আবদ্ধ শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মসংস্থান এর সুযোগ নেই বললেই চলে। তারা ঘর থেকে বের হবার সুযোগ কম পান বলে সহজে তাদের দেখাও মেলে না। হয়তো ঘরে বসেই হা পিত্যেশ করছেন সমাজের এমনই ভাগ্যবিতাড়িত মানুষদের খুঁজে বেড়াচ্ছে 'অদম্য'। তিনি

এরপর ২য় পৃষ্ঠা

প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরীপ : প্রচারণার অভাব, সমন্বয়হীনতার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদক

সমাজ সেবা অধিদফতরের আওতায় দেশব্যাপি পরিচালিত প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরীপের সফলতা এবং লক্ষ্য পূরণ দুর্বল প্রচারণায় সমন্বয়ের অভাবে হুমকির মুখে পড়েছে। পাশাপাশি মাঠ কর্মীদের দুর্ব্যবহার এবং জরীপ সম্পর্কে অস্পষ্ট ধারনা জরীপের মূল উদ্দেশ্যটি ক্ষতিগ্রস্ত করছে বলে মনে করেন সংশি-ষ্ট অনেকে।

জানা যায়, ২০১১-১২ অর্থ বছরে দেশের ৮টি উপজেলাতে পাইলট প্রকল্প হিসেবে চালু করা হয় জরীপ কার্যক্রমটি এবং পরবর্তীতে ১২টি উপজেলার ১৫৯ টি ইউনিয়নে এটি বিস্তৃত করা হয়। ২০১৩ সালের ১ জুন থেকে সারা দেশের সবকটি গ্রাম ও ইউনিয়ন পর্যায়ে এই তথ্য সংগ্রহের কাজ শেষ হবার কথা ছিলো ৩১শে আগস্টের মধ্যে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত জরীপকারী মাঠ কর্মীদের পূর্ণাঙ্গ কাজ শেষ না হওয়াতে ডিসেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে এই সময়সীমা। সরকার কর্তৃক দুই মেয়াদে বরাদ্দকৃত মোট ৩২ কোটি টাকার মধ্যে গত অর্থবছরে দেওয়া হয়েছিলো ১৪ কোটি টাকা। জানা গেছে বাকি টাকা চলতি অর্থবছরে দেয়া হবে। কিন্তু প্রচার প্রচারণার ক্ষেত্রে ইলেক্ট্রনিক এবং প্রিন্ট মিডিয়াকে সেভাবে ব্যবহার না করায় দেশের বিভিন্ন স্থানের অধিকাংশ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিই এই জরীপ সম্পর্কে অবগত নন-এমন মতামতই উঠে এসেছে দেশ ব্যাপী বিভিন্ন মাঠ কর্মী এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও সংগঠনের কাছ থেকে।

দেশের বিভিন্ন স্থানের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সাথে কথা বলে দেখা যায়, অনেক ক্ষেত্রেই মাঠ কর্মীরা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের তথ্য সমূহ যথাযথ ভাবে গ্রহণ করছেন না এবং জরীপ কাজটির উদ্দেশ্য সম্পর্কে সঠিক ধারনা দিতে পারছেন না।

চাঁপাইনবাবগঞ্জের স্কুল শিক্ষক এবং উন্নয়ন কর্মী ক্ষীণ দৃষ্টি প্রতিবন্ধী আজমল হোসেন (মামুন) এর সঙ্গে যোগাযোগ করে জানা যায় সমাজসেবা অধিদফতরের জরীপকারী মাঠ কর্মীদের অভদ্রোজনিত ব্যবহারের চিত্র। মামুন অভিযোগ করেন, মাঠ কর্মীদের অভদ্রোচিত ব্যবহারের কারণে অনেকেই এই জরীপে নিবন্ধন সম্পর্কে আগ্রহ হারিয়ে ফেলছেন। তিনি আরো অভিযোগ করেন, বিদ্যালয় চলাকালিন সময়ে মাঠ কর্মীরা তার বাসায় এসে তাকে না পেয়ে চলে যান। পরবর্তীতে তিনি বাড়ি থেকে ১২ কিলোমিটার দূরে উক্ত মাঠ কর্মীর নির্ধারিত স্থানে গিয়ে জরীপ এ তালিকাভূক্ত হোন। গণমাধ্যমের প্রচারণা

যথেষ্ট নয় অভিযোগ করে তিনি আরও বলেন, "দুর্বল প্রচারণার বিষয়টি বেশ চোখে পড়ার মতো। রিক্সায় মাইকিং এর পাশাপাশি পাড়ায় পাড়ায় মসজিদের ইমাম সাহেবের মাধ্যমেও প্রচারণা চালানো গেলে এই জরীপের খবর ভালভাবে ছড়িয়ে পড়তো।"

আরো জানা যায়, উক্ত এলাকাতে অনেক ক্ষেত্রেই মাঠ কর্মীরা গ্রাম পুলিশের সহায়তায় জরীপের কাজ শেষ করছেন অনেকটা দায় সারা ভাবে। এই ব্যাপারে সংশিষ্ট এলাকাগুলোর প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়ে কাজ করা সংগঠন সমূহকে অন্তর্ভূক্ত করা দরকার ছিল বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।

সুলতানা অত্যন্ত ক্ষোভের সাথে বলেন, "প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য পরিচালিত জরীপ কর্মে সংশি-ষ্ট কর্তৃপক্ষের আরও সহনশীল এবং সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। এছাড়াও তাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণেরও অভাব রয়েছে। তাঁর বাসায় তথ্য গ্রহণে আসা মাঠ কর্মী কিভাবে ফর্ম পূরণ করবে সেটিও আমাকে দেখিয়ে দিতে হয়েছে যা অত্যন্ত দুঃখ এবং লজ্জাজনক!"

তিনি বলেন, "অনেক ক্ষেত্রেই মাঠ পর্যায়ের জরীপকারীরা এলাকাতে এসে আপত্তিজনক ভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের খোঁজ করেন, যা জরীপ কর্মটির উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করবে। যেমনঃ কোন এলাকাতে এসে কানা, খোঁড়া, অন্ধ ইত্যাদি শব্দ গুচ্ছ ব্যবহার করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের খোঁজা অত্যন্ত আপত্তিকর। এতে করে জরীপকারি এবং জরীপ কর্মটির প্রতি অশ্রদ্ধাজনক মনোভাব তৈরি হওয়ার পাশাপাশি অনেক ক্ষেত্রেই জরীপে অংশগ্রহণের ইচ্ছাতে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়।"

অপর শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি মেজর জহিরুল ইসলাম বলেন, "প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সাহায্য করবার ক্ষেত্রে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হল তাদের শারীরিক প্রতিবন্ধিতা নির্ণয় করা, বর্তমান জরীপের অনেক ক্ষেত্রেই যা সম্ভব নয়। এছাড়া জরীপ ফর্মের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় আবাসস্থলের সাথে তাদের ভবনে বাইরে এবং ভেতরের প্রবেশগম্যতা কতটুকু এবং এলাকার অন্যান্য বিনোদন, বিপনন বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলের প্রবেশগম্যতার বিষয়টি সঠিকভাবে নিরূপনের প্রশ্ন যোগ করা যেতে পারতো। পাশাপাশি শিক্ষা বা পেশাগত যোগ্যতার সাথে তারা কি কি ধরণের ভোকেশনাল প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সেটিও যুক্ত করা যেতো।"

চট্টগ্রামের হালিশহর এলাকায় নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অভিযোগ করেন সংশি-ষ্ট এলাকার আরবান কমিউনিটি প্রোগ্রাম অফিসার (UCDP) কে দুইবার তাগাদা দেওয়া সত্ত্বেও তার পরিচিত বিভিন্ন এলাকার আরো কয়েকজন প্রতিবন্ধী মানুষসহ

এরপর ২য় পৃষ্ঠা

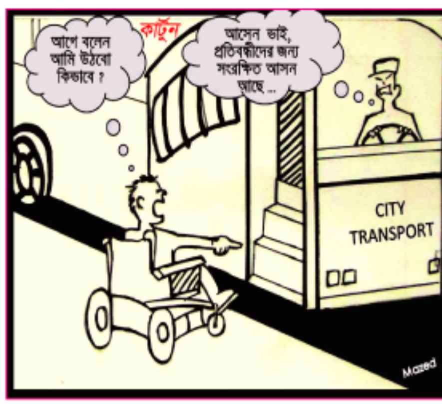

লেখা আহ্বান

প্রতিবন্ধী মানুষদের অধিকারের কথা তুলে ধরার পাশাপাশি, সমাজে সচেতনতা তৈরীতেও ভূমিকা রাখার ক্ষুদ্র প্রয়াস, ছোট পরিসরে শুরু হওয়া বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী মানুষের একমাত্র মুখপত্র অপরাজেয় ডিসেম্বর ২০১৩, ১ম বর্ষপূর্তী উপলক্ষে আমরা হাজির হচ্ছি বিশেষ সংখ্যা, বিশেষ আয়োজন নিয়ে। থাকছে দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের লেখা। থাকতে পারে আপনার পাঠানো নির্বাচিত লেখাটিও।

দুঃখ-দুর্দশার গল্পকথা, জীবনধারা কিংবা পথ চলায় নানান বাধাবিপত্তি, সামাজিক অসঙ্গতিময় অব্যবস্থাপনা অথবা অনিয়ম-দুর্নীতি সমস্ত কিছুই তুলে ধরতে চাই আমরা। সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়া এই অনিয়মের বিরুদ্ধে লিখে পাঠান আমাদের ঠিকানায়।

লেখা পাঠানোর শেষ সময় : ৩১ অক্টোবর, ২০১৩।

সম্পাদক
অপরাজেয়

সর্বজনীন প্রবেশগম্যতা

১ম পৃষ্ঠার পর

অপারগ শুধুমাত্র একটুখানি সহায়ক ব্যবস্থা আর দৃষ্টিভঙ্গীর অভাবে।
এখানে উল্লেখ্য যে, সরকারি পরিপত্রে বলা হয়েছে, আন্তঃজেলা বিআরটিসি বাসে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য ২টি সীট সংরক্ষিত থাকবে এবং নগর পরিবহনে যতজন বাসে আরোহণ করবেন ততজনকেই আসন দিতে হবে। সরকারী যানবাহন তথা বাস, ট্রেন ইত্যাদিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ তাদের পরিচয় পত্র প্রদানপূর্বক অর্ধেক ভাড়ায় ভ্রমণ করতে পারেন। এমনকি, মোটরযান অধ্যাদেশ ১৯৮৩ এর ৬০(৩) (XXII) ধারার স্টেজ ক্যারেজ (বাস/মিনিবাস ইত্যাদি) এর রুট পারমিট অনুমোদনের ক্ষেত্রে আরোপযোগ্য শর্তসমূহের আলোকে ২৯-০৩-২০০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত ঢাকা মেট্রোপলিটন আঞ্চলিক পরিবহন কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঢাকা শহরে যে বাসগুলো চলে তার ৯টি এবং মিনি বাস হলে ৬টি সিট নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য সংরক্ষিত রাখার অনুরোধ করা হয়। আর এই বিষয়টি আমরা অনেকেই হয়তো জানি না বা জানলেও মানি না। এটা মানার অভ্যাস তৈরী করা দরকার। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য যাও বা সংরক্ষতি আসন আছে কিন্তু শারীরিক প্রতিবন্ধী তথা হুইলচেয়ার ব্যবহারকারী ব্যক্তির জন্য সেই আসনগুলোতে উঠে বসার কোনই ব্যবস্থা নেই। তারা কি তবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্যে কি গণ্য নন? যদি হয়ে থাকেন তাহলে তাদের জন্য বাস, ট্রেন, লঞ্চ ইত্যাদিতে সহজে উঠে বসার সুব্যবস্থা কেন নেয়া হচ্ছে না?
সারা দেশে বিআরটিসি এর শতাধিক বাস চলাচল করে। এর একটিতেও কি হুইলচেয়ার ব্যবহারকারীদের সহজে প্রবেশের জন্য সহায়ক ব্যবস্থা তৈরির উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে না? আমরা সকলে কি এটা নিয়ে সম্মিলিতভাবে কিছু করতে বা ভাবতে পারি না!
বাধামুক্ত চলাচলের কথা বলতে গেলে প্রাসঙ্গিকভাবেই চলে আসে ফুটপাথের কথাও। ক্লান্ত পথিক, বৃদ্ধ, অসুস্থ্য রোগী, মহিলা, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের ফুটওভার ব্রিজ অতিক্রম করা সম্ভব নয়। একজন হুইলচেয়ার ব্যবহারকারীকে ফুটওভার ব্রিজ ব্যবহার করতে বাধ্য করা আইনতঃ বাংলাদেশ সংবিধানের গণতন্ত্র ও মানবাধিকার অনুচ্ছেদ ১১, কৃষক ও শ্রমিকের মুক্তি অনুচ্ছেদ ১৪, সুযোগের সমতা অনুচ্ছেদ ১৯ (১) (২), আইনের দৃষ্টিতে সমতা অনুচ্ছেদ ২৭, জবরদস্তি শ্রম নিষিদ্ধকরণ অনুচ্ছেদ-৩৪ (১), চলাফেরার স্বাধীনতার অনুচ্ছেদ ৩৬ এর পরিপন্থী। পথচারীদের অধিকার বিষয়ে সিটি কর্পোরেশনের আইন- ২০০৯ এর তৃতীয় তফসিল ১৯.১ এ বলা হয়েছে পথচারী যাহাতে পথ চলিতে বাধাগ্রস্ত না হন এবং তাহারা নিরাপদ ও অনায়াসে পথে চলাচল করিতে পারে সেই জন্য কর্পোরেশন প্রবিধান দ্বারা যানবাহনের চলাচল নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে। পথচারীদের নিরাপদে যাতায়েতে সমান্তরাল জেব্রা ক্রসিং, সিগন্যাল, হকার ব্যবস্থাপনা, বাথরুম ও ছায়ার ব্যবস্থা নিশ্চিত করিবে। কিন্তু বাস্তবে এমন কোন ফুটপথ পাওয়া যাবে না যা ব্যবহার করে একজন হুইলচেয়ার ব্যবহারকারী কিছুদুর পথ চলতে পারে। নিশ্চিত বাধাগ্রস্ত হবেন ছোটবড় খানা-খন্দকে, বিভিন্ন ভবনের মালিক নিজেদের মতো করে নির্মাণ সামগ্রী ফেলে ফুটপাত দখল করে নিয়েছেন, বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক খোঁড়াখুঁড়ি আর সংস্কার হচ্ছে প্রতিনিয়ত, ফলে সড়কের সঙ্গে ফুটপাতের যে অ্যালাইনমেন্ট থাকার কথা, সেটা নষ্ট হয়েছে। অধিকন্তু প্রয়োজনীয় ফুটপাথের দুদিকেই ঢালু/স্লোপ না থাকায় একজন হুইলচেয়ার ব্যবহারকারী পারছেন না ফুটপথ ব্যবহার করতে আর দশজন স্বাভাবিক মানুষের মত। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সহজ চলাচলে দিক নির্দেশনা সংক্রান্ত ব্রেইল ব্লকের ব্যাপারেও কোথাও উল্লেখ নেই। আমাদের দেশের মানুষের মাঝে ধারনাই নেই দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি কারো সাহায্য ছাড়াই ব্রেইল ব্লক এর সাহায্য ফুটপাথ, জেব্রা ক্রসিং রাস্তা পারাপারসহ বিভিন্ন জায়গায় একা একাই চলাচল করতে পারেন।
এ সকল আইনের সফল পরিপূর্ণ কাঠামো হচ্ছে আইনী কাঠামোগত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ সনদ (Convention On the Rights Of Persons with Disabilities- CRPD) যা ২০০৬ সালে গৃহীত হয়। বাংলাদেশ ৯ মে ২০০৭ সালে এই সনদে স্বাক্ষর করে এবং একই বছর ৩০ নভেম্বর তা অনুমোদন করে। এখানে উল্লেখ্য, বাংলাদেশ এর অনেক আগেই ২০০১ সালের প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন পাশ করে যা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষার একটি মাইলফলক। বর্তমানে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরামের সহযোগিতায় সিআরপিডির আদলে "বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার আইন ২০১৩"-এর খসড়া চূড়ান্ত করেছে যা এখন সংসদ কর্তৃক অনুমোদনের অপেক্ষায়।
এই আইন পাসের পর নীতিগতভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য কাজ করার দায়বদ্ধতা তৈরি হবে আশা করি। যদিও আইনটি থেকে কমিশন বাদ দেয়ায় এর কার্যক্ষমতা অনেকখানি বিলুপ্ত হয়ে যাবে।
প্রথমে 'মানুষ' এবং পরে তার 'প্রতিবন্ধিতা', এ উপলব্ধি থেকে পৃথিবীর উন্নত দেশগুলো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হয়ে বিভিন্ন কর্মক্রম হাতে নিয়েছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে তাদের মূল ধারায় নিয়ে আসতে উন্নত বিশ্বে আজ শিক্ষা, রাস্তাঘাটে আলাদা সীমানা, অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা দানসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে, তাদের উন্নয়নের মূল ধারায় প্রবেশ করিয়ে দক্ষ শ্রমশক্তিতে পরিণত করা হয়েছে। এছাড়াও ওই দেশসমূহে প্রতিবন্ধী মানুষেরা শক্ত সামাজিক নিরাপত্তা ঘোষণার মধ্যে থাকায় তাদের নানা ধরনের সুযোগ সুবিধা প্রাপ্ত হয় এবং সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, সুইডেন, নরওয়ের কথা বলা যায় সেখানে প্রতিবন্ধী মানুষেরা স্বাচ্ছন্দে চলাচল করতে পারেন, বাসে, ট্রামে, মেট্রোরেলে-সাবওয়েতে ভ্রমণ, বিভিন্ন ব্যাংকে বীমা, বিশ্ববিদ্যালয়ে সহজে প্রবেশের জন্য সবধরনের অবকাঠামোগত সুবিধাদি সংযুক্ত রয়েছে, ফলে একজন প্রতিবন্ধীকে অন্যের ওপর নির্ভর করতে হয় না।
আপনি আমি মিলেই সমাজ। প্রতিবন্ধী তথা ভিন্নভাবে সক্ষম ব্যক্তিরাও সমাজের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এদেশের প্রতিবন্ধী মানুষেরা প্রয়োজনীয় সুযোগ ও সমর্থন পেলে সমাজের অন্যান্য সকলের মতো তারাও কর্মদক্ষতা ও সৃষ্টিশীলতার পরিচয় দিতে পারে। শুধুমাত্র সর্বজনীন প্রবেশগম্যতার সু-ব্যবস্থা না থাকার মত প্রতিবন্ধকতাই আজ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে যেমন শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত করছে তেমনি যোগ্য প্রতিবন্ধীকে কর্মসংস্থান তথা সকল প্রকার উন্নয়ন কর্মকান্ড থেকে বঞ্চিত রাখছে। উন্নত বিশ্বে আজ প্রতিবন্ধিতা কোনো সমস্যা নয়। কেননা তারা তাদের প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে উপযুক্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে তাদের সমাজের মূল স্রোতে নিয়ে এসেছে। উন্নত বিশ্বের ন্যায় আমরাও আমাদের দেশের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নের মূল ধারায় নিয়ে আসতে পারি। এজন্য প্রয়োজন যাতায়াত ব্যবস্থাকে তাদের জন্য সহায়ক করে তৈরি করা। যেন তারা চার দেয়ালের বন্দী জীবন থেকে বেড়িয়ে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এর মাধ্যমে নিজেকে যোগ্য করে গড়ে তোলার পাশাপাশি দক্ষতা প্রমাণের সুযোগ পায়। আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার, জাতীয় আইন, সংবিধানিক অধিকার সবখানেই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জায়গা বাড়াতে সবাইকে আন্তরিক ও সচেষ্ট ভূমিকা রাখতে হবে, সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে, কর্পোরেটকে সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর কল্যাণে এগিয়ে আসতে হবে। প্রতিবন্ধী মানুষকে বাইরের জগতের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার মত সুখকর স্বপ্নকে সুন্দর অর্থবহ ও সার্থক করতে সবার সমন্বিত প্রয়াস দরকার যার মধ্য দিয়ে আমাদের বাংলাদেশ হয়ে উঠবে সত্যিকার অর্থে ভবিষ্যত প্রজন্মের নিরাপদ ঠিকানা।

(মেজর জহিরুল ইসলাম
SCIDAB এর সহ-সভাপতি এবং B-SCAN এর একনিষ্ঠ শুভাকাঙ্ক্ষী।)

সাক্ষাৎকার

১ম পৃষ্ঠার পর

লাগবে। সিঙ্গেল ডেকার বাসের সাথে ফুটপাতের যে দূরত্ব বা উঁচুনিচু তা নিরসনের জন্য আমাদের একটা অবকাঠামো তৈরী করতে হবে, যা একটু সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। সব চেয়ে বড় বিষয় হলো, র‍্যাম্পযুক্ত বাস চলাচলের ক্ষেত্রে যে সব সুবিধাগুলো থাকার কথা তা আমাদের দেশে নেই।
আমরা শুধু ঢাকা শহর নিয়ে চিন্তা করছিনা। ঢাকা শহরে আশেপাশে যে সব শহরগুলো আছে বিশেষ করে- গাজীপুর, নারায়নগঞ্জ, মানিকগঞ্জ নিয়ে আমাদের একটা "স্ট্র্যাটেজি ট্রান্সপোর্ট প্ল্যান" আছে, যা সরকার ইতিমধ্যে অনুমোদন করেছেন। আর এটা কো-অরডিনেট করছে সড়ক বিভাগের অধীনে বিআরটিএ।
<u>সব বাসে না হলেও অন্তত প্রত্যেক রোডে একটি র‍্যাম্পযুক্ত বাস কী নামানো যায় না? সেই সাথে লোকালের পাশাপাশি দুরপাল্লার অন্তত রুট প্রতি একটি বাসে কি র‍্যাম্প বসানো কোন পরিকল্পনা নেবার কথা ভাবছেন?</u>
-মোটর যান আইনকে আরো পরিবর্তন করে গ্রহনযোগ্য করে তোলা হচ্ছে এবং হালনাগাদ করার জন্য মন্ত্রী পর্যায়ে কাজ করা হচ্ছে। এর জন্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও সংগঠনগুলোকে বিভিন্ন সুপারিশ ও পরামর্শ দিতে এগিয়ে আসতে হবে।
সর্বশেষ হিসেব অনুযায়ী, ১৮,৫০০০০ যানবাহনের মধ্যে বিআরটিসি দ্বারা মাত্র ১২০০ গাড়ী পরিচালিত। যেহেতু এটি একটি সরকারী প্রতিষ্ঠান, তাই আমরা চেষ্টা করি এর সুবিধা যেন বেশি সংখ্যক লোক গ্রহণ করতে পারে।
আমরা যেহেতু সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে সড়ক ও পরিবহনের ক্ষেত্রে পাবলিক সেক্টরকে আমরাই প্রতিনিধিত্ব করি, তাই আমরা মনে করি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কথা মাথায় রেখে আগামী অর্থ বছরে কিছু বাস কেনা হবে যেখানে আমরা বিশেষ কিছু পরিবর্তন করে প্রতিবন্ধীবান্ধব করবো। হয়তো সব বাসে করা সম্ভব হবে না। এইছাড়া দূর পাল্লার বাসেও পরীক্ষামূলক ভাবে করার পরিকল্পনা আছে।
বর্তমান সরকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি খুবই সহানুভূতিশীল। আশা করি, র‍্যাম্পযুক্ত বাস পরিবহন সেক্টরে একটা নতুনমাত্রা যোগ করবে।
বিশেষ করে হুইলচেয়ার ব্যবহারকারীদের কথা মাথায় রেখে বাসগুলোতে যেন হুইলচেয়ার প্রবেশগম্য করা যায় সে ব্যাপারে আমরা দৃষ্টি আলোকপাত করবো।

<u>বিআরটিসি'র পাশাপাশি ব্যক্তি মালিকানাধীন বাসগুলোতেও র‍্যাম্পযুক্ত করার জন্য আপনারা কী কোন পদক্ষেপ নিবেন?</u>
-এটা আসলে বিআরটিসির "রুলস অব বিজনেস"-এ পড়ে না। এটা বিআরটিএ দ্বারা পরিচালিত। বিআরটিএ চাইলে কিছু শর্ত আরোপ করতে পারে।

<u>"প্রতিবন্ধী সহায়ক যানবাহন" এই ব্যাপারে আপনাদের কী কোন প্রচার- প্রচারণার পরিকল্পনা আছে?</u>
- এটি একটি ভাল প্রস্তাব। তবে আমরা মূলত নিরাপদ সড়ক, শিশু, বৃদ্ধ। নারী-পুরুষরা যাতে নিরাপদে ভ্রমন করতে পারে তার জন্য প্রচারণা করে থাকি। তবে ভবিষ্যতে কোন প্রচার-প্রচারণা করা হলে, তাতে অবশ্যই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কথা অন্তর্ভূক্ত করা হবে।
<u>আপনার মূল্যবান সময় দেয়ার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।</u>
-আপনাকেও ধন্যবাদ।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বাজেট

১ম পৃষ্ঠার পর

বিষয়গুলো তুলে ধরার লক্ষ্যে একটি আলাদা অধিদপ্তরের দাবি বহুদিনের। যদিও আজ পর্যন্ত সে দাবী আলোর মুখ দেখেনি। ওয়ানস্টপ সার্ভিস সেন্টার ঠিক কিভাবে খোলা হয়েছে কিংবা পরিচালিত হচ্ছে তা নিয়েও প্রশ্নের অবকাশ রয়েছে। বেশ কজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির কাছে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে তারা এ ধরণের কার্যক্রম সম্পর্কে কিছুই জানেন না। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন এসে যায় এ বিষয়ে অবগত করানোর দায়িত্ব কাদের? তারা নিজের গরজে খোঁজ নেবে নাকি সরকারের প্রতিনিধির পক্ষে প্রচার প্রচারণা বা সেবাসমূহের খবরাখবর পৌছুবে!
সাম্প্রতিক সময়ে সাধারণ বিদ্যালয়ে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর সংখ্যা কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও একীভূত শিক্ষা ব্যবস্থার আওতায় তাদের ব্যাপক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে প্রয়োজন বিশেষ কার্যক্রমের। শিক্ষাক্ষেত্রে যে নূন্যতম কোটা ব্যবস্থা রাখা হয় তা এই বিশাল প্রতিবন্ধী গোষ্ঠির চেয়ে সত্যিই অপ্রতুল। এমনকি প্রতিবন্ধিতাকে জয় করে অনেকেই ভালো কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি হতে পারলেও সেখানে প্রয়োজনীয় সহায়ক ব্যবস্থা না থাকায় নানান সমস্যার সম্মুখিন হতে হচ্ছে। এমনকি দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপিঠে প্রতিবন্ধী কোটা ছাড়াই মেধাতালিকায় জায়গা করে নিয়েছে এমন মেধাবীর সংখ্যা নেহায়েত কম নয়। কিন্তু বিধিবাম মেধাতালিকায় স্থান পাওয়াটা যেন তাদের কাল হয়ে দাঁড়ায়। সকল শিশু বিনামুল্যে পাঠ্যপুস্তক পেলেও ব্রেইল বই পাচ্ছে না দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা। যাও বা আছে তা পর্যাপ্ত নয়। নেই ইশারা ভাষায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক। নেই সহজ চলাচলের সুবিধার্থে নির্মিত ফুটপাত, র‍্যাম্প। "নেই নেই শুধু নেই।"
এতো এতো নেই এর মাঝে অর্থমন্ত্রীর সদ্য পেশকৃত বাজেটে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ঠদের জন্যে যা বরাদ্দ হয়েছে তা পর্যাপ্ত নয় বলেই মনে হয়। অথচ ২ লাখ ২২ হাজার ৪৯১ কোটি টাকার এই বিশাল বাজেটে সরকারের কাছে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দাবী ছিলো বিভিন্ন খাতে ৫৬০ কোটি টাকা বরাদ্দের। যদিও অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য মাসিক ভাতা ৩০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩৫০ টাকায় এবং ভাতাভোগীর সংখ্যা ২৯ হাজার ৬০০ জনের বাড়িয়ে তিন লাখ ১৪ হাজার ৬০০ উন্নীত করার লক্ষ্যে ১৩২.১৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এবং একই সঙ্গে আগামী বাজেটে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর উপবৃত্তি প্রাপ্তদের সংখ্যা ১০ হাজার বাড়িয়ে ২৯ হাজারে উন্নীত করার জন্য ৯০ লাখ টাকা বাড়িয়ে ৯ কোটি ৭০ লক্ষ টাকাসহ সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ১৬৪.০৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করার পাশাপাশি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আরো কিছু প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দ হয়েছে। কিন্তু প্রাথমিক ও গণ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জন্য বরাদ্দকৃত প্রায় ১১ হাজার কোটি টাকার মাঝে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য সুনির্দিষ্ট বরাদ্দ নেই বললেই চলে। বাকি অন্যান্য খাতেও স্বল্প ধার্যকৃত এই অর্থ অনেকটা মুখ ঢাকে তো পা ঢাকে না এর মতোই। প্রস্তাবিত বাজেটে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের একীভূত করার অঙ্গীকার থাকলেও এবারের বাজেটেও নেই মন্ত্রণালয় ভিত্তিক বরাদ্দ। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, ক্রীড়া, সংস্কৃতি এবং বিনোদনে কোন প্রকল্পও প্রণয়ন করা হয়নি। এমনকি বিগত সময়ে প্রতিবন্ধী জনগণের উন্নয়নে সরকারের নির্বাচনী ও রাজনৈতিক অঙ্গীকারের কোন প্রতিফলনই নেই এই বাজেটে। নেই অধিকার বিষয়ক আইনের উল্লেখ। আবারও সেই নেই এর হাহাকার। এই অর্থের সবই যে অবকাঠামোগত ক্ষেত্রে খরচ হবে তাও নয়। বরাদ্দের বড় অংশটি যাবে কর্মীদের বেতন ভাতা বাবদ। তাই বরাদ্দ কমলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নমূলক কাজের সুযোগ আরো সংকুচিত হয়ে পড়ে। যেহেতু প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্ব-সংগঠনগুলোর কাঠামো দুর্বল তাদের সামাজিক নিরাপত্তা এবং দীর্ঘস্থায়ী জীবিকা কর্মসূচির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভবপর হয়ে উঠে না। ফলে বরাদ্দের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সকল উন্নয়ন খাতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য উপযুক্ত বরাদ্দ নিশ্চিত করা যেমন উচিত। তেমনি জাতীয় ব্রেইল প্রিন্টিং প্রেস ও ইশারা ভাষার ব্যাপক ব্যবহার, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য প্রবেশগম্যতা যুগোপযোগী, সহায়ক উপকরণ উৎপাদন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য যানবাহনকে উপযুক্ত করার জন্য বাজেট বরাদ্দ রাখা যুক্তিযুক্ত। বাজেটের গতি শুধুমাত্র সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাঝেই সীমিত না রেখে স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ, স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, মহিলা ও শিশু, যুব ও ক্রীড়া এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বাজেটেও পৃথক বরাদ্দের প্রয়োজন রয়েছে। ২০১৩-২০১৪ বাজেটে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দাবীর প্রতিফলন না ঘটায় পূনর্বিবেচনার দাবীও জানিয়েছে তারা সরকারের কাছে।
এদিকে বাজেট বক্তব্যে মাননীয় অর্থমন্ত্রী প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর পিছিয়ে পড়া এ অংশকে অর্থনৈতিক অগ্রগতি মূলস্রোতে সম্পৃক্ত করা বিকাশমান অর্থনীতির জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ উল্লেখ করে বলেন, "প্রতিশ্রুত ছিলো প্রত্যেকটি মন্ত্রণালয়ের মধ্যমেয়াদি বাজেট প্রণয়ন, একীভূত বাজেট প্রক্রিসহ জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়ন এবং জেলাওয়ারি বাজেট প্রদান। পরবর্তী বছরগুলোতে এইসব বিষয়ে আমাদের অগ্রগতি মহান সংসদে বিবৃত করি এবং নতুন কিছু উদ্যোগেরও ঘোষণা দেই।" আরো উল্লেখ করেন "একীভূত প্রবৃদ্ধি (Inclusive Growth) অর্জনের নীতি কৌশলের আওতায় বাংলাদেশে দারিদ্র কমে এসেছে উল্লেখযোগ্য হারে। সচরাচর কোন উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ধনী-গরীবের মধ্যে একটি ব্যবধান সৃষ্টি করে।" তিনি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার রায় আলাদা একটি নীতিমালা গঠন, বাংলা ইশারা ভাষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপনসহ উন্নয়ন খাতে সরকারের আরো নানামুখী চিন্তাভাবনা রয়েছে বলে জানান।
আমরা এমন একদেশে বাস করছি যেখানে কিনা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিজেদের সমস্যা সমাধানের পথ নিজেদেরই খুঁজতে হয়। তাদের সমস্যা দেখার যেন কেউ নেই। গণপরিবহনে নির্বিঘ্নে যাতায়াত করতে চাইলেও রয়েছে পদে পদে বাধা। হুইলচেয়ার আরোহীদের জন্য রাস্তায় নিরাপদে চলাচলের জন্য ফুটপাত এবং বাসে সহজে প্রবেশগম্য পথ/র‍্যাম্প একটি স্বপ্ন এবং বহুদিনের দাবি থাকলেও ক্ষুদ্র এ সমস্যা সমাধানের পথ না মিটিয়ে সরকারের অলাভজনক ৬৫৪ কোটি টাকার ডেমু ট্রেন, ৯০ লাখ টাকার আর্টিকুলেটেড বাস এমনকি ২১ হাজার কোটি টাকার মেট্রোরেলের মত বিশাল বেহিসেবী প্রকল্পের দিকেই ঝুঁকছেন। এদিকে দারিদ্র দূরীকরণে সরকারের কর্মসৃজন, খাদ্যনিরাপত্তামূলক কার্যক্রম এবং সমতা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রশিক্ষণ ও কারিগরি সহায়তা প্রদানের কর্মসূচী থেকে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী বঞ্চিত হয়ে পড়ছে। এ বিষয়ে সরকারী দিক নির্দেশনা না থাকার ফলে অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ওএমএস, ভিজিডি, ভিজিএফ, টিআর (খাদ্য), জিআর (খাদ্য), খাদ্য সহায়তা (পার্বত্য চট্টগ্রাম) ও কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা) আওতায় প্রস্তাবিত বাজেটে বরাদ্দকৃত টাকায় হতদরিদ্র প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য কোন সুযোগ রাখা হয়নি। এবার নারীর ক্ষমতায়ন নিয়েও সরকার কাজ করেছে। অনেক ক্ষেত্রে তার বেশ কিছু বাস্তবায়ন হচ্ছে। তবে পেশাগত ক্ষেত্রে বেশীরভাগই নারীর পেশা কিংবা চাকরির নিশ্চয়তা খুবই কম। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির রাষ্ট্রায়ত্ব বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে প্রবেশে সুযোগ সুবিধা সমূহ নারী প্রতিবন্ধীদের নগন্য রেখে পুরুষ প্রতিবন্ধীর জন্য সুযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে বেশি। পুরুষের চেয়ে নারীর অধিকার বাড়তি নয় চাইছি নারী পুরুষের সমান অধিকার এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রাপ্তি। এমনকি রাষ্ট্রীয় দিক দিয়ে অটিজমকেই বেশি প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে। কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে অনেকাংশে অটিজমকেই প্রাধান্য দেয়া হয় সরকারি নির্দেশনাবলির অজুহাতে। প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা নিজের প্রচেষ্টায় ভাল ফলাফল করে নিজ উদ্যোগে ভর্তি হতে গিয়ে এমন জোগান্তিতে পড়লে আবারও প্রশ্ন জাগে ভর্তির সুযোগ সুবিধা প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধান রাষ্ট্রের দায়িত্ব? এ বৈষম্যের ফলে সবার মাঝে যথেষ্ট বিভ্রান্তির সৃষ্টির হচ্ছে। অটিজম নিয়ে কোন বিদ্বেষ নেই। বৈষম্য না রেখে সকলেরই সমসুযোগ নিশ্চিত বরাবরেরই দাবি।
যা হোক এত কিছুর পরেও কিছু ক্ষেত্রে ধারণা করা যায় দেরীতে হলেও সরকারের সংশ্লিষ্ট মহলের এ বিষয়ে সুনজর পড়েছে। তবে তা অতি মন্থর গতিতে। সাম্প্রতিক বাজেটে শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের হুইলচেয়ার, দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ঘড়ি স্থানীয় পর্যায়ে উৎপাদনের ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন কর (মূসক) অব্যাহতির কথা বলা হয়েছে। এছাড়া বিনামূল্যে ফিজিওথেরাপি, অকুপেশনাল থেরাপি, হিয়ারিং এইড, ভিজ্যুয়াল টেস্ট, কাউন্সেলিং প্রশিক্ষণ এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও পূনর্বাসনকেন্দ্রের মাধ্যমে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ছাত্র ছাত্রীদের ব্রেইল প্রেসে মুদ্রিত বই সরবরাহসহ বেসরকারিদ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ কোটা প্রবর্তনের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।
পাঁচ বছর মেয়াদি সরকারের প্রতিটা বাজেটেই নির্বাচনী বাজেট হওয়াটা সমিচিন। তবে আমাদের দেশের ক্ষেত্রে এর প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ আলাদা। মেয়াদের শেষ প্রান্তে এসে উন্নয়নমূলক কাঠামো বাস্তবায়নের তোড়জোর শুরু হয়। এতে করে নির্বাচনী ইশতেহার আর বাজেটের প্রতিশ্রুতি যাই বলুন না কেনো উভয়ই বাস্তবায়নের আলো দেখতে পায় কদাচিৎ। তারপরেও আশার কথা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পৃথক ও স্বতন্ত্র অধিদপ্তর দীর্ঘদিনের দাবীটি শেষ সময়ে এসে প্রধানমন্ত্রী জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনকে একটি পূর্ণাঙ্গ অধিদপ্তরে রূপান্তরের ঘোষণা দিয়েছেন। বর্তমান সরকারের মেয়াদের পর যেই সরকারই আসুক, একবছরের ঘোষিত বাজেটের বাস্তবায়নের দায় দায়িত্ব সম্পূর্ণই সেই সরকারের উপরে বর্তায়। তাই পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের জবাবদিহিতার ক্ষেত্রটাও মজবুত করতে হবে।
প্রতিবন্ধী মানুষের সকল চাহিদা এবং প্রতিবন্ধীবান্ধব কাঠামো বাস্তবায়নে আমরা এখনো অনেক পিছিয়ে আছি। কারণ আমরা তাদের সমস্যাকে নিজেদের মতো করে ভাবছি না। না! আমার কোন প্রতিবন্ধিতা নেই। সমাজের আর দশজনের মতই সুস্থ্য স্বাভাবিক ভাবে চলাফেরা করতে পারছি এখনো আল্লাহর রহমতে। তবে এর কোন নিশ্চয়তা নেই যে কোন একদিন আমিও হতে পারি প্রতিবন্ধিতার শিকার। এই ভাবনাকে প্রাধান্য দিতে হবে। তাদের অকর্মণ্য কিংবা বোঝা হিসেবে না দেখে সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎ গড়ে দেয়ার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে আমাদেরই এগিয়ে আসতে হবে। আমাদের বিশ্বাস করতে হবে তাদেরও যোগ্যতা আছে সমাজ, দেশ এবং পৃথিবী বদলে দেবার।

জেলা প্রতিনিধি আহ্বান

অপরাজেয় পত্রিকায় বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক খবর প্রদানের জন্য জেলা প্রতিনিধি আহ্বান করা হচ্ছে।

যোগাযোগ :
সম্পাদক
অপরাজেয়
মোবাইল : ০১৬৭০৮১২৭৯৮

অপরাজেয় পত্রিকার বিজ্ঞাপন হার

১। প্রথম পৃষ্ঠা	(রঙ্গিন)	২,০০০/- প্রতি ইঞ্চি কলাম
২। শেষ পৃষ্ঠা	(রঙ্গিন)	১,৮০০/- প্রতি ইঞ্চি কলাম
৩। ভিতরের পৃষ্ঠা	(রঙ্গিন)	১,৫০০/- প্রতি ইঞ্চি কলাম
৪। ভিতরের পৃষ্ঠা	(সাদা কালো)	১,০০০/- প্রতি ইঞ্চি কলাম

যোগাযোগ :
সম্পাদক
অপরাজেয়
মোবাইল : ০১৬৭০৮১২৭৯৮

অপরাজেয় পত্রিকার দিনাজপুর প্রতিনিধি

জনাব যাদব চন্দ্র রায়
দক্ষিণ শিবপুর, জয়দেবপুর সদর, দিনাজপুর।

বিক্রয় প্রতিনিধি আহবান

অপরাজেয় পত্রিকার প্রচার ও প্রসার বাড়ানোর লক্ষ্যে সারাদেশের জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে বিক্রয় প্রতিনিধি আহ্বান করা হচ্ছে। আগ্রহীদের যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

বিস্তারিত জানতে সম্পাদকের সাথে যোগাযোগ করুন।

সম্পাদকীয়

হাজারো প্রতিবন্ধকতার মাঝেও বাসযোগ্য একটি বাংলাদেশের স্বপ্ন

দেশের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রকৃত পরিসংখ্যান নিরূপনের দাবী তাদের দীর্ঘদিনের। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংখ্যাগত, প্রকারগত এবং পূর্ণাঙ্গ বিবরণ নিশ্চিত করা গেলেই ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার প্রতিবন্ধিতার ধরণ অনুযায়ী তাদের জন্যে সরকারের সঠিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং সামাজিক ও নাগরিক এই বৈষম্য দূরীকরণে এই পরিসংখ্যান অত্যন্ত জরুরী। ভবিষ্যত প্রতিবন্ধী প্রজন্মের জন্য একটি সুন্দর অবকাঠামোগত বা বাসযোগ্য বাংলাদেশ তৈরীতে আমাদের এই নিজস্ব জরীপটি সফল হলে একীভূত শিক্ষা ও সহায়ক যাতায়াত ব্যবস্থা, কর্মসংস্থানের পাশাপাশি স্পেশাল স্কুল, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, রিসার্চ সেন্টার ইত্যাদি সুপরিকল্পিতভাবে গড়ে তুলতেও সরকারের সহায়ক হবে। তাই ২০১১ সালের জাতীয় আদমশুমারীতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সঠিক সংখ্যা নিরূপনে সরকারের ব্যর্থতার পর সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে এ বছরের পহেলা জুন হতে শুরু হওয়া প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরীপ কার্যক্রমের খবরে অনেক আশায় বুক বেঁধেছিল দেশের অবহেলিত এই জনগোষ্ঠী।

কিন্তু তাদের দীর্ঘদিনের স্বপ্নকেই যেন ধুলিস্যাৎ করতে অনেকটা নীরবেই চলছে শনাক্তকরণ জরীপ কার্যক্রম। অভিযোগে প্রকাশ সরকার কর্তৃক মোটা অংকের অর্থ পেলেও দুর্বল প্রচারণা, নানা অব্যবস্থাপনা ও মাঠ কর্মীদের দুর্ব্যবহারের ফলে সচেতন প্রতিবন্ধী মানুষের ক্ষোভ উপচে পড়ছে।

মূলত দারিদ্রসীমার নিচে বসবাসকারী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা যেমন নিজেদের অধিকারের বিষয়ে সচেতন নন তেমনি উপরতলার অভিভাবকগণের মাঝেও অসচেতনতা কিংবা চক্ষুলজ্জা ভীতি বিদ্যমান। এদেশের বেশীরভাগ মানুষ তার প্রতিবন্ধী সন্তানটিকে লুকিয়ে রাখতে চান। আর এ কারণেই প্রকৃত সংখ্যা বের করে আনার জন্য সরকার সংশি-ষ্ট মহলের প্রয়োজনীয় কিছু পদক্ষেপ নেওয়া জরুরী ছিলো। সকলের স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণের নিমিত্তে রেডিও, টিভি ও সংবাদপত্রে ব্যাপক প্রচার প্রচারণার পাশাপাশি জরীপ কাজে নিয়োজিত মাঠ কর্মীদের সঠিক প্রশিক্ষণের অভাব এই ব্যর্থতার জন্য মূলত দায়ী। অনেকে মনে করছেন জরীপ ফর্মটিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমস্যা সংক্রান্ত প্রশ্ন আরো ব্যাপকভাবে তুলে আনা উচিৎ ছিলো।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন-২০১৩ এখন জাতীয় সংসদ কর্তৃক অনুমোদনের প্রতীক্ষায় দিন গুনছে। এতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নাম ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত, ভোট প্রদান এবং নির্বাচনে অংশ নেয়া অর্থাৎ প্রার্থী হওয়ার সুযোগ ছাড়াও রয়েছে তাদের অধিকার ও মর্যাদার সুরক্ষা, শারীরিক-মানসিক উন্নয়ন, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ নিশ্চিতের বিষয়টি। সর্বজনীন প্রবেশগম্যতা বাস্তবায়নের বিষয়টি আরো দৃঢ়ভাবে উঠে এসেছে নতুন আইনে। রয়েছে আইন অমান্যকারীদের জন্য কঠিন শাস্তির বিধান। অপরদিকে গত তিন বছর ধরে লাল ফিতায় আবদ্ধ হয়ে আছে প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশনকে আলাদা অধিদফতরে রূপান্তরের দাবীটিও। এছাড়াও জাতীয় ইমারত নির্মান বিধিমালা ২০১৩ খসড়া বাস্তবায়নের অপেক্ষায় রয়েছে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নে নিয়োজিত সংস্থাগুলোকে অন্তর্ভুক্তকরণের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। বিশেষত সরকার পরিচালিত নীতি নির্ধারণ সংশি-ষ্ট মহলে তাদের দায়িত্বশীল পদে উপস্থিতির গুরুত্ব অপরিহার্য। এ কথা অনিস্বীকার্য যে অ-প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চেয়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরাই তাদের নিজ নিজ সমস্যা ও তা সমাধানের উপায় ভালো বুঝেন। কিন্তু শিক্ষা ও নানা ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকার দরুণ সর্বত্র নিশ্চিত হচ্ছে না তাদের অংশগ্রহণ। নিজেদের অধিকার আদায়ের এ লড়াইয়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শুধু ঐক্যবদ্ধ হলেই চলবে না তাদের আরো

চিঠিপত্র

রমনা পার্কের ছাউনিতে হুইলচেয়ার সহায়ক র‍্যাম্প চাই

আমাদের দেশে হুইলচেয়ার ব্যবহারকারী ব্যক্তিদের সর্বত্র প্রবেশগম্যতা না থাকায় ঘর থেকে কোথাও বেরুনো দুঃসাধ্য বলা যায়। আমি একজন হুইলচেয়ার ব্যবহারকারী ব্যক্তি হিসেবে দিনের পর দিন ঘর বন্দী থাকাটাই আমার নিয়তি হিসেবে মেনে নিয়েছি। বাবা মা আমাকে মাঝে মাঝে রমনা বটমূলে ঘুরাতে নিয়ে যায়। সেখানে চমৎকার কিছু ছাউনি দেয়া বসার বেঞ্চি আছে, যেখানে বসে প্রাকৃতিক মনোরম পরিবেশ উপভোগ করা যায়। রমনা অস্তাচল গেটের কাছের ছাউনিটাতেই প্রায়ই গিয়ে বসি আমি। কিন্তু সমস্যা হয় তখনই যখন আমার হুইলচেয়ার সমেত প্রায় ২/৩ ধাপ সিঁড়ি পেরিয়ে যেতে হয়। প্রতিবারই উঠা নামার সময় অন্তত তিন/চার জনের সাহায্যে নানান ঝক্কি পোহাতে হয় এই হুইলচেয়ারটা নিয়ে। বেশ কয়েকবার লক্ষ করেছি সেখানে আমার মত আরো কয়েকজন হুইলচেয়ার ব্যবহারকারি আসেন। হয়তো আমারই মত খানিকটা স্বস্তির শ্বাস নিতে। কিন্তু তারাও একি ভোগান্তির শিকার।

শুনেছি, ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড ও ঢাকা মহানগরী ইমারত নির্মাণ বিধিমালা ২০০৮ অনুযায়ী সর্বত্র হুইলচেয়ার প্রবেশগম্যতা রাখার বিধান আবশ্যকীয় করা হয়েছে। তাই, সংশি-ষ্ট কর্তৃপক্ষের বিনীত দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক বলছি, সিঁড়ি হুইলচেয়ার ব্যবহারকারী ব্যক্তির চলার পথের বাঁধা, কিন্তু র‍্যাম্প সকলের জন্য উন্মুক্ত। তাই কর্তৃপক্ষ যদি রমনা বটমূলের অন্তত একটি ছাউনিতে সিঁড়ির পাশে হুইলচেয়ার সহায়ক পথ র‍্যাম্প নির্মাণের উদ্যোগ নেন তাহলে আমার মত অনেকেই উপকৃত হবেন।

ফারজানা সুলতানা জ্যোতি
ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা।

বৈষম্য ও নির্যাতনে প্রতিবন্ধী নারীর দিন যাপন

রোকেয়া সামিয়া

কল্পনা করা যাক একটি মেয়ের কথা। নাম লিলি। শ্রবণ প্রতিবন্ধী। কিন্তু তার আরেকটি পরিচয় সে অত্যন্ত সাহসী একজন মানুষ। প্রচন্ড রকম প্রতিকূল পরিবেশে জীবন যুদ্ধে জয়ী হবার চেষ্টায় বদ্ধপরিকর এই মেয়েটির সাহস তাকে বোঝায় সে পিছিয়ে পড়া মানুষ নয়। তার এলাকায় এমন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই যেখানে ইশারা ভাষায় পাঠদানের ব্যবস্থা রয়েছে। তার ভাষা কেউ বুঝে না। সে নিজেও কাউকে বোঝাতে পারে না। কখনো সখনো তার এই অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে শারীরিক লাঞ্ছনাও সইতে হয়। পরিবার তথা সমাজের এহেন গঞ্জনা অপবাদ সয়ে কোনভাবে কিছুটা পড়ালেখা করেছে সে অদম্য মনের জোরে। এবার তাঁকে নিজের পায়ের নিচে শক্তভিত্তি খুঁজে বার করতেই হবে। নতুবা এ সমাজ তার উপরে মানসিক এ নির্যাতন চালিয়েই যাবে।

লিলি নামের মেয়েটির ঘটনাটি কাল্পনিক বলা হলেও এটি সত্য বাংলাদেশের সমাজে, যেখানে লিলির মত অসংখ্য কাল্পনিক চরিত্র বাস্তব হয়ে আছে ঘরে ঘরে। শুধু শ্রবণ প্রতিবন্ধী নারীই নয়, বিভিন্ন ধরণের প্রতিবন্ধিতা নিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে বসবাসকারী অগুনতি নারী প্রতিবন্ধীকে সইতে হচ্ছে পারিবারিক এবং সামাজিক গঞ্জনা। মনে প্রশ্ন জাগে, সমস্যাটি কি তাদের প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত নাকি সামাজিক সুযোগ-সুবিধা বা সচেতনতার অভাব সম্পর্কিত? সংবিধানমতে একটি রাষ্ট্রে প্রতিটি নাগরিকেরই সম অধিকার রয়েছে। তবে বাংলাদেশের মত রাষ্ট্রে যেখানে সকল নাগরিকের জন্যে এটি সুদূর পরাহত সেখানে প্রতিবন্ধী মানুষগুলোর সমস্যার দিকে চোখ দেবার মানুষ যেন বেশ কম। একজন প্রতিবন্ধী নাগরিক তার প্রতিবন্ধিতার জন্যে কি ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হন একটু পর্যালোচনা করলেই বোধ করি পুরো চিত্রটি কিছুটা পরিষ্কার হবে।

> একবিংশ শতাব্দীতে এসেও যে সমস্যাটি সামাজিকভাবে একজন প্রতিবন্ধী মানুষের চলার পথে প্রথম বাধা নিয়ে আসে তা হলো প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কে বিদ্যমান কুসংস্কার। এখনো অনেক ৎেত্রেই যে কোন শুভকাজে প্রতিবন্ধী মানুষের উপস্থিতিকে অকল্যাণকর বলে মনে করা হয়।

এই একবিংশ শতাব্দীতে এসেও যে সমস্যাটি সামাজিকভাবে একজন প্রতিবন্ধী মানুষের চলার পথে প্রথম বাধা নিয়ে আসে তা হলো প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কে বিদ্যমান কুসংস্কার। এখনো অনেক ক্ষেত্রেই যে কোন শুভকাজে প্রতিবন্ধী মানুষের উপস্থিতিকে অকল্যাণকর বলে মনে করা হয়। প্রতিবন্ধিতা নিয়ে বিদ্যমান আরো অসংখ্য কুসংস্কারের মধ্যে একটি হলো অনেকেই মনে করেন একজন প্রতিবন্ধী নারী সুস্থ সন্তানের জন্ম দিতে অক্ষম। আর এখানেই আমরা সবচেয়ে বড় ভুলটি করে থাকি। কারণ প্রতিবন্ধিতা কোন অসুস্থতা নয় এটি একটি অবস্থা মাত্র। হতে পারে কিছু কিছু বংশগত (সব ক্ষেত্রে নয়) প্রতিবন্ধী নারী প্রতিবন্ধী সন্তান জন্ম দিচ্ছেন কিন্তু বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই তারা অ-প্রতিবন্ধী সন্তান জন্ম দিতে সক্ষম। আমাদের সমাজে জন্মলগ্ন থেকেই প্রতিবন্ধী নারীদের আলাদা দৃষ্টিতে দেখা হয়। ফলে শহর বা গ্রামে হোক, প্রতিবন্ধী মেয়ে বা মহিলারা মূলত তিনটি বৈষম্যের শিকার হন, এক- নারী হিসেবে, দুই- প্রতিবন্ধী হিসেবে এবং তিন- দরিদ্রের কষাঘাতে। যার সাথে যুক্ত হয় কুসংস্কার ও বৈষম্যমূলক নীতির নির্যাতন। শুধু কুসংস্কারই নয় যদি শিক্ষার দিকে চোখ ফেরানো হয় তাতে দেখা যায়, শিক্ষার মত একটি প্রাথমিক মানবাধিকারের ক্ষেত্রেও নানাক্ষেত্রে প্রতিবন্ধিতার জন্যে প্রতিবন্ধী মানুষেরা নানাবিধ সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন। নানারকম প্রতিবন্ধিতা যেমন, বাক ও শ্রবণ, দৃষ্টি, বুদ্ধি বা মানসিক প্রতিবন্ধিতা এবং বিভিন্ন ধরণের শারীরিক প্রতিবন্ধী মানুষের জন্যে বিদ্যমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বা কর্মস্থলে নানারকম সহায়ক সুবিধা (যেমন - শারীরিক প্রতিবন্ধী মানুষের উপযোগী টয়লেট, প্রবেশগম্যতা, ইশারা ভাষা ও ব্রেইল পদ্ধতির অধিকতর প্রচলন) থাকা প্রয়োজন তা অনেক সময়ই গ্রাহ্য করা হয় না। মূলধারার স্কুলগুলোতে প্রতিবন্ধী মানুষদের ভর্তিতে এবং ভর্তির পরেও তাদের অভিভাবকেরা নানাবিধ সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন। অনেকসময় প্রতিবন্ধী শিশুরা তাদের সমবয়সী, এমনকি শিক্ষক-শিক্ষিকা দ্বারাও অনেকসময় উত্যক্ত হচ্ছেন।

যদিবা নানাবিধ সংগ্রামের পথ পেরিয়ে শিক্ষাগ্রহণ শেষে কেউ কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন সেখানেও নানান প্রতিকূলতার মুখোমুখি হতে হয়। এক্ষেত্রে সমস্যা তিন ধরণের হতে পারে। প্রথমত, ভৌত অবকাঠামোগত এবং বিশেষ সুবিধা দেয়া সংক্রান্ত। যেখানে প্রতিবন্ধী মানুষটি কাজ করবেন সেখানে তার বসার জায়গাটি, তার প্রবেশগম্যতার দিকটির দিকে অনেকসময়ই সামগ্রিকভাবে নজর রাখা হয় না। এছাড়াও বলা যায়, শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে বিশেষ ভাববিনিময় ব্যবস্থার অপ্রতুলতার কথা। দ্বিতীয়ত, প্রতিবন্ধী মানুষেরা অন্য সহকর্মীদের তুলনায় বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই কম মজুরি পান যেখানে কারণ হিসেবে দেখানো হয় তাদের শারীরিক প্রতিবন্ধিতার ফলে কম কাজ করছেন। যা আদৌ সঠিক নয়। সহমর্মিতার অভাবে কাজের ক্ষেত্রে মজুরি বৈষম্য এতে কাজ করে। তৃতীয়ত, নারী প্রতিবন্ধীদের জন্যে যেকোন কর্মক্ষেত্রে কাজ করা সবচেয়ে দূরূহ। নারী প্রতিবন্ধীদের জন্যে কিছু সহায়ক সুবিধা লাগে যা অনেকসময় কর্মক্ষেত্রে থাকে না। যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়াই তাদের ছাটাই করা হয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে কর্মস্থলে প্রাপ্ত সম্মান দেয়া হয় না তাদের। সহকর্মীরা তাদেরকে অতিরিক্ত বোঝা বিবেচনায় প্রায়শই নগন্য কারণে দোষারোপ ও উত্যক্ত করে নিজেদের সব ক্ষমতা জাহির করতে চান।

আমাদের দেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি এই নির্যাতনকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়-

*আবেগীয় নির্যাতন ঃ হুমকি, ভীতি বা মৌখিকভাবে কটূক্তি।

*দৈহিক নির্যাতন ঃ যে কোন শারীরিক অত্যাচার বা সন্ত্রাসের শিকার হওয়া। এবং

*যৌন নির্যাতন ঃ ধর্ষণ বা বলপ্রয়োগ করে, ভয় দেখিয়ে বা প্রতারণার আশ্রয়ে বা কৌশলে যৌন কর্মকান্ডে লিপ্ত হতে বাধ্য করা।

তাদের প্রকৃত নামের বদলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রকৃত নামের সাথে প্রতিবন্ধিতার ধরনযুক্ত করে বিকৃতভাবে সম্বোধন করা হয়। এটা যেমন দুঃখজনক তেমনি নিষ্ঠুর এবং একইসঙ্গে অমানবিকও। সমাজে সবচেয়ে নির্বাসিত, অবহেলিত ও অসহায় মানুষদের মধ্যে পড়ে প্রতিবন্ধী নারীরা। অ-প্রতিবন্ধী নারীদের চেয়ে তারা বেশি যৌন নির্যাতনের শিকার হয়। তারমধ্য আবার দৃষ্টি ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী নারীরা সবচেয়ে বেশি নির্যাতনের শিকার হয়। শ্রবণ প্রতিবন্ধী নারীদের বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই ভাব বিনিময় করতে না পারা প্রধান সমস্যা বলে বিবেচিত হয় অন্যদিকে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী নারীদের ক্ষেত্রে তাদের স্বাক্ষ্য আদালত গ্রাহ্য করে না। সোজা কথা তারা ন্যায়বিচারের সুযোগ পায় না। আদালতে মামলা দায়ের করেও অনেক সময় বিপাকে পড়ে বাদীপক্ষ। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে চক্ষু লজ্জায় অনেক পরিবার বিষয়টি ধামাচাপা দেয়। ফলে এসব নির্যাতনের খবর গণমাধ্যমেও কম প্রকাশিত হয়। ব্যতিক্রম অল্প কিছু গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবর বিভিন্ন প্রতিবন্ধী সংগঠন ও মানবাধিকার সংগঠনের দৃষ্টি আকর্ষিত হলে মানববন্ধন, সংবাদ সম্মেলন ও বিবৃতির জোয়ার ছুটে যায়। কিন্তু আদতে তেমন কিছু হয় না। তার মূল কারণ, পরবর্তীতে ওসব সংগঠন সমূহ ফলোআপ করে না যার ফলে বিচারের বাণী নিভৃতে কাঁদে। বাংলাদেশে বছরে কতজন প্রতিবন্ধী নারী বিচ্ছিন্নভাবে নির্যাতিত হয় তার সঠিক পরিসংখ্যান নেই। যদিও পূর্বের তুলনায় এ সংখ্যা দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এবার একটি পরিসংখ্যানের দিকে চোখ বোলানো যাক যেখানে বলা হচ্ছে কিভাবে প্রতিবন্ধী শিশু এবং নারী যৌন নির্যাতনের হার বেশি। ২০১০ সালে বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশন এবং সেভ দ্য চিলড্রেন পরিচালিত 'প্রতিবন্ধী শিশুদের যৌন নির্যাতনের ঝুঁকি' শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, প্রতিবন্ধী শিশুদের ৫১ দশমিক ৩৮ শতাংশ কোনো না কোনোভাবে যৌন নির্যাতনের শিকার হয়। প্রতিবন্ধিতার দিক থেকে সবচেয়ে বেশি নির্যাতনের শিকার হয় মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুরা। এই হার ৩২ দশমিক ৪৩ শতাংশ। এ ছাড়া শারীরিক প্রতিবন্ধী ৩১ দশমিক ৫৩, শ্রবণ ও বাকপ্রতিবন্ধী ১৯ দশমিক ৮১, দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ১৯ দশমিক ২১ শতাংশ যৌন নির্যাতনের শিকার হয়। জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরামের এক গবেষণায় দেখা গেছে, প্রতিবন্ধী শিশু ও নারী নির্যাতন এবং ধর্ষণের হার ১০ গুণ বেশি।

বর্তমান এ যুগে নিজেকে একজন মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার যুদ্ধে লিপ্ত অ-প্রতিবন্ধীদের নারীদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে প্রতিবন্ধী নারীরাও জোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন নিজেদের অস্তিত্বের লড়াইয়ে। অথচ অবজ্ঞা আর সমাজের রূঢ় দৃষ্টির কারণে শুধু বাংলাদেশেই নয়, এশিয়ার অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশেও ব্যাপক অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক পরিবর্তন সত্বেও প্রতিবন্ধী নারীদের অবস্থান সেই আগের অবস্থাতেই রয়ে গেছে। একজন নারী সারা জীবনের ধাপগুলো পার করে কখনও মেয়ে, কখনও মা, কখনও স্ত্রী হিসেবে। কিন্তু অসচেতন এই সমাজ একজন প্রতিবন্ধী নারীকে ভুল করেও বিয়ের উপযুক্ত ভাবতে পারে না। এখানে তার প্রতিবন্ধিতাই তার সবচেয়ে বড় অক্ষমতা হিসেবে গণ্য করা হয়। সেদিক থেকে প্রতিবন্ধী পুরুষদের এহেন প্রতিকূল পরিবেশের সম্মুখীন তেমন একটা হতে হয় না। বিয়ের ব্যাপারে প্রতিবন্ধী নারীদের ক্ষেত্রেই একটি মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব কাজ করে এবং বেশীরভাগের মধ্যেই পারিবারিক ও সামাজিক নেতিবাচক মনোভাব পরিলক্ষিত হয়। অনেকের ধারণা প্রতিবন্ধিতা তাদের ভাগ্যের ফল, যা থেকে পরিত্রাণ লাভের কোন উপায় নাই। কিন্তু খুব স্বাভাবিকভাবেই মহিলা ও কিশোরী প্রতিবন্ধীদের মধ্যেও অপ্রতিবন্ধী মহিলা ও কিশোরীদের ন্যায় ভালবাসা বা বিবাহের ক্ষেত্রে একই আবেগ কাজ করে। কিন্তু অনেক উত্তরদাতার মধ্যেই গভীর হতাশার প্রতিচ্ছবি লক্ষ্য করা গেছে এই কারণে যে, কেউই তাদের প্রস্তাব করেন নি বা একটি ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভালবাসা বা বিয়ের ব্যাপারে এগিয়ে আসেনি। অল্প কিছু ব্যতিক্রম ব্যতীত দাম্পত্য জীবনে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই প্রতিবন্ধী মহিলারা একই সঙ্গে স্বামী ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের দ্বারা কটূক্তি, শারীরিক নতুবা মানসিক নির্যাতনের শিকার হন। ভালোবাসার সম্পর্কে জড়িত কোন মহিলা বা কিশোরী যদি প্রতিবন্ধিতার শিকার হন বা তার বিদ্যমান প্রতিবন্ধিতার মাত্রা যদি লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে তাহলে তা তাদের সম্পর্ক ও বিবাহের উপর মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। একই পরিস্থিতি পরিলক্ষিত হয় যদি কোন বিবাহিত প্রতিবন্ধী মহিলা তাদের গৃহস্থালীর কাজ বা তাদের ওপর অর্পিত পারিবারিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়। অনেক স্বামী আবেগীয় কারণে প্রতিবন্ধিতার বিষয়টি মেনে নিলেও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে এ পরিস্থিতি বা চারিপাশের প্রতিকূলতার সাথে যুদ্ধ করে কোনরূপ সাহায্য করতে পারেন না। এসব ক্ষেত্রে মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানেই দাম্পত্য জীবনে বিচ্ছেদ ঘটে। কিছু ক্ষেত্রে আবার প্রতিবন্ধী মেয়েকে শুধুমাত্র যৌতুকের লোভে বিয়ে করার উদাহরণও রয়েছে। পরবর্তীতে অযৌক্তিক কারণ দেখিয়ে যৌতুকের সমস্ত সম্পদ হাতিয়ে নিয়ে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে চলে গেছে।

বাংলাদেশ সরকার নির্যাতিত নারী ও কন্যা শিশুর সহায়তার জন্য মহিলা সহায়তা কেন্দ্র চালু করেছে। সেখানে নির্যাতিত নারীদের আশ্রয়, বিনা খরচে আইনগত পরামর্শ ও মামলা পরিচালনার জন্য সহায়তা দেয়া হয়।

আত্মনির্ভরশীলতার লক্ষ্যেও বিভিন্ন বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এখানে। নারী ও কন্যা শিশু নির্যাতন প্রতিরোধের লক্ষ্যে দেশের বেশ কিছু জেলায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আদালত স্থাপিত হয়েছে। বিভিন্ন মানবাধিকার ও নারী সংগঠন কাজ করছে এ নিয়ে। তবুও অন্যান্য নারীদের মতো প্রতিবন্ধী নারী নির্যাতনের সংখ্যা কমেনি। পত্র-পত্রিকা খুললে নারী নির্যাতনের খবর দেখতে খারাপ লাগে কিন্তু প্রতিবন্ধী নারী ও কিশোরী নির্যাতিত হলে তা নিশ্চয়ই হৃদয়কে আরো নাড়া দেয়। বুক কেঁপে ওঠে মানুষের হিংস্র বিকৃত রুচির কথা জানতে পেরে। প্রতিবন্ধী নারীদের প্রতি যৌন নির্যাতন বন্ধে সমাজে সচেতনতার সাথে সরকারি কঠোর আইন প্রণয়ন অত্যন্ত জরুরী। সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি দেবেন এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

সেপ্টেম্বর ২০১৩ অপরাজেয়

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির উপর নির্যাতন : প্রতিরোধ ও প্রতিকার

আবু হানিফ মোহাম্মদ

কেস স্টাডি-০১

১৪ আগস্ট ২০১২। ঈদের ছুটি প্রায় শুরুর হচ্ছে। ঢাকার ইসলামপুর রোডের সোনার বাংলা মার্কেটের সামনে একটি মেয়েকে কাঁদতে দেখেন সেখানে কর্মরত শ্রমিক নাসিম। মেয়েটিকে তিনি কোতোয়ালি থানায় নিয়ে যান। মেয়েটি শুনতে বা বলতে পারে না। ফলে পুলিশও মেয়েটির নাম-ঠিকানা জানতে ব্যর্থ হয়। ১৫ আগস্ট মেয়েটিকে নিয়ে আসা হয় ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারে। কিন্তু এখানেও কর্মকর্তারা মেয়েটির নাম-ঠিকানা জানতে পারেননি। মেয়েটি লিখতে জানে না, তাই তার সঙ্গে ইশারায় যোগাযোগ চলে। সেন্টারের সহকারী পুলিশ কমিশনার রুশনাক জাহান ঈদের ছুটি শেষে এসডিএসএল-এর ইশারা ভাষা দোভাষী মো. আরিফুল ইসলামের সহায়তায় জানতে পারেন, মেয়েটির নাম "কবিতা"। বাবার নাম রফিক। সেন্টারের পুলিশ ২৩ আগস্ট কবিতাকে দোভাষীসহ নিয়ে যায় সেই এলাকায়, যেখানে তাকে পাওয়া গেছে। স্থানীয় এক পান বিক্রেতাকে পরিচিত হিসেবে শনাক্ত করে মেয়েটি। পরে সেই পান বিক্রেতাই কবিতার মা-বাবাকে খবর দেয়।

কবিতার মা বুলু বেগম জানান, কবিতার ফুপু ও তার পরিবারের সদস্যরা ঢাকায় ভিক্ষা করেন। গত বছরের মতো এবার রোজার ঈদেও ফুপু কবিতাকে ঢাকায় নিয়ে এসেছিলেন ভিক্ষায় লাগিয়ে ভালো আয়ের আশায়। এ কাজ করতে গিয়েই সে হারিয়ে যায়। শ্রবণ প্রতিবন্ধী মানুষকে সহায়তা দিতে বা তার ওপর নির্যাতনের প্রতিকারের ক্ষেত্রে ইশারা ভাষার দোভাষীর অপরিহার্যতা অনুভব করে ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার। আর প্রতিবন্ধী মানুষকে সহায়তা দিতে গিয়ে সেবার বৈচিত্রতার নতুন অভিজ্ঞতা হয় পুলিশ বিভাগের।

কেস স্টাডি-০২

৫ সেপ্টেম্বর ২০১২। কুড়িগ্রামের ধর্ষিত শ্রবণ প্রতিবন্ধী সাবিনা (ছদ্মনাম) তার এক সপ্তাহ বয়সী সন্তানকে কোলে নিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে উপস্থিত হন জবানবন্দি দেয়ার জন্য। রৌমারী থানার এস আই মতিনের সহায়তায় এসডিএসএল'র ইশারা ভাষার দোভাষীর সহায়তায় সাবিনার জবানবন্দি নেয়া হয়। ধর্ষণের কারণে গর্ভধারণ করা সাবিনা যে সন্তানের জন্ম দেন, তাকে কোলে নিয়েই জবানবন্দি দেন তিনি! ঘটনাটি এখন পর্যন্ত কোনো সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হয়নি।

মামলার এফআইআরের তথ্য অনুযায়ী, কাঠমিস্ত্রি জোসন আলীর পালিত মেয়ে সাবিনা। ঘটনার দিন তার মা সবুরা বেগম এবং বাবা কাজে চলে গেলে দুপুরের দিকে প্রতিবেশী বাদু মিয়া তাকে ঘরের ভিতরে ধর্ষণ করে। বাদু মিয়া তাকে ভয় দেখায়, যাতে বিষয়টি জানাজানি না হয়। সমাজ আর লোকলজ্জার ভয়ে চুপ থাকেন সাবিনাও। কিন্তু গর্ভবতী হয়ে পড়লে মা-বাবাকে আসল ঘটনা জানাতে বাধ্য হন তিনি। আসামিকে চিনিয়েও দেন। পরে স্থানীয় এক সালিশে বাদু মিয়া অপরাধ স্বীকার করে এবং সাবিনাকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দেয়। যদিও পরে সে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। এ কারণে থানায় মামলা হতেও দেরি হয়ে যায়। ধর্ষিত এই সাবিনা ও তার সন্তানের দায়িত্ব কি এখন রাষ্ট্রেরও নয়? অথচ রাষ্ট্র বরাবরই নির্যাতিত নারী আর ধর্ষণের কারণে জন্ম নেয়া সন্তানের দায়িত্ব নিতে অবহেলা করে আসছে, যখন সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর হাজার কোটি টাকার সদ্ব্যবহার হচ্ছে না।

দেশে প্রতিনিয়তই অসংখ্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটছে। এমনকি মনো-সামাজিক প্রতিবন্ধী মানুষকে 'ছেলেধরা সন্দেহে' পিটিয়ে মারার মতো অমানবিক ঘটনাও এ দেশে ঘটেছে। অনেক ক্ষেত্রেই এসব ঘটনা প্রকাশে সংবাদ মাধ্যমের কার্যকর ও সঠিক ভূমিকা দেখা যায় না। এমনকি প্রতিবন্ধী জনগণের প্রতি সহিংসতা ও নির্যাতন বন্ধে মূলধারার মানবাধিকার সংগঠনগুলো নিজেদের অদক্ষতা ও অক্ষমতা তুলে ধরে। এ সমস্যা শুধু সংবাদ মাধ্যমেরই নয়, প্রশাসন, পুলিশ, বিচার ব্যবস্থাসহ সর্বক্ষেত্রে। এ কারণেই প্রতিবন্ধী মানুষদের সংগঠন (ডিপিও) বা প্রতিবন্ধী মানুষদের নিয়ে কর্মরত বেসরকারি সংস্থাগুলো গত কয়েক বছর ধরে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টিতে সোচ্চার হয়ে উঠেছে। আশার কথা হলো, ইদানিং সংবাদ মাধ্যমে প্রতিবন্ধী মানুষের নির্যাতন ও সহিংসতার ঘটনা আগের তুলনায় বেশি আসছে। ধীর গতিতে হলেও এগিয়ে আসছে বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থাও। এ অবস্থার পেছনে মূল কারণ প্রতিবন্ধী মানুষ বা প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে রাষ্ট্র ও সমাজের সর্বস্তরে অজ্ঞানতা। রাষ্ট্র ও সমাজ বহুদিন পর্যন্ত মানুষ হিসাবে প্রতিবন্ধীদের অধিকারের স্বীকৃতি ও মর্যাদা দেয়নি। অবশ্য গত দেড় দশকে ধীরে ধীরে প্রতিবন্ধী মানুষের প্রতি সমাজের সেই ধারণায় পরিবর্তন এসেছে। জাতিসংঘ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অধিকার সনদের (সিআরপিডি) শরিক রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ এ সনদের বাস্তবায়ন শুরু করায় প্রতিবন্ধী মানুষকে এখন অসুস্থ বা রোগীর বদলে মানব বৈচিত্র্যের অংশ বিবেচনা করা হচ্ছে।

অন্যদিকে বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন ২০০১ কার্যকর হলেও তাতে প্রতিবন্ধী মানুষের নির্যাতন ও সহিংসতা প্রতিরোধে কোনো ব্যবস্থা রাখা হয়নি। নির্যাতন বা মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তি রাষ্ট্রের সহায়তা বা সুবিচার পেয়েছেন- এমন দৃষ্টান্তও বিরল। প্রতিবন্ধী মানুষের বিশেষ চাহিদার কথা বিবেচনায় রেখে আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ-সুবিধাও দেশে গড়ে ওঠেনি। আসলে সিআরপিডিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য নতুন কোনো অধিকারের ঘোষণা দেয়া হয়নি। বরং একজন মানুষ হিসাবে সব অধিকার যাতে তারা ভোগ করতে পারেন সেজন্য প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মানবাধিকার রক্ষায় বিশেষ ব্যবস্থা নেয়ার পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় সব সুযোগ সুবিধা ও ব্যবস্থাগুলো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উপযোগী করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে এই সনদে। এর আলোকেই দেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অধিকার আইন করার উদ্যোগ নেয়া হলেও এর খসড়ায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রতি নির্যাতন ও সহিংসতা প্রতিরোধে কার্যকর সুরা ব্যবস্থা নেয়ার কোনো কথা বলা হয়নি। প্রতিবন্ধী মানুষের সুবিচারপ্রাপ্তি নিশ্চিত করতে সিআরপিডির ১৪ ধারায় পুলিশ ও কারা কর্তৃপক্ষসহ বিচার বিভাগের কর্মীদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের কথা বলা হয়েছে। এখন প্রশ্ন, নারী ও শিশুর ঝুঁকি বা শিশুর বয়স বিবেচনায় নিয়ে তাদের ওপর নির্যাতন প্রতিরোধে বিশেষ ব্যবস্থা থাকলেও প্রতিবন্ধী মানুষদের জন্য তেমন কোনো ব্যবস্থা কেন নেয়া হচ্ছে না?

রাষ্ট্র, সমাজ, আদালত ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো এখনো বিচারপ্রার্থী প্রতিবন্ধী মানুষের প্রতি খুব একটা সংবেদনশীল নয়। ফলে বিচারপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে তারা বিভিন্নভাবে বাধার মুখে পড়ছেন। অথচ সিআরপিডি অনুযায়ী দেশের আইনগুলো প্রতিবন্ধী মানুষের উপযোগী করে সমন্বয় সাধনের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। তারপরও সরকার দেশের বিদ্যমান আইন এবং মানবাধিকার সুরক্ষার বিভিন্ন কার্যক্রমকে প্রতিবন্ধী মানুষের উপযোগী করার কোনো উদ্যোগ এখনো নেয়নি। আইন, বিচার ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানগুলিতে বিচারপ্রার্থী প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য বাংলা ইশারা ভাষা বা বিকল্প যোগাযোগ পদ্ধতির মতো সুযোগ-সুবিধা না থাকায় শ্রবণ-বাক, বুদ্ধি, মনো-সামাজিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা নানা সমস্যায় পড়েন। আবার এসব প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোয় শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চলাচলের ব্যবস্থা না রাখায় তারা জটিলতার মুখে পড়েন। প্রতিবন্ধিতার ভিত্তিতে বৈষম্য, সঙ্গতিপূর্ণ বন্দোবস্ত, একীভূত উন্নয়ন এবং সর্বজনীনগম্যতা ইত্যাদি বিষয়েও এই সব কর্তৃপক্ষের স্পষ্ট ধারণা থাকা জরুরি। অন্যদিকে সামাজিক বিচ্ছিন্নতার কারণে নিরাপত্তা, আইন ও বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রতিবন্ধী মানুষের স্পষ্ট ধারণা থাকে না। এছাড়া নির্যাতিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি পারিবারিক ও সামাজিক বিভিন্নমুখী চাপে নির্যাতনকারীর সঙ্গে আপস করতে বাধ্য হন।

মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে সোসাইটি অব দি ডেফ অ্যান্ড সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজার্স (এসডিএসএল) এর আইনি সহায়তার কিছু অভিজ্ঞতা উল্লেখ করা হলো।

- ২০০৯ সালে কুড়িগ্রাম জেলার একজন ধর্ষিত শ্রবণ প্রতিবন্ধী নারীর জবানবন্দি দেয়ার ক্ষেত্রে ইশারা ভাষার দোভাষী সহায়তার মাধ্যমে এসডিএসএল-এর যাত্রা শুরু হয়। দেশে এসডিএসএলই একমাত্র সংগঠন যারা বিনামূল্যে আদালতে নির্যাতিত নারী ও শিশুদের দোভাষী সহায়তা দিয়ে আসছে।
- চতুর্থ শ্রেণীর পদে দুজন শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তির নিয়োগে কোটা চেয়ে উচ্চ আদালতে রিট পিটিশন করা হয়।
- ২০১২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ৭টি সরকারি শ্রবণ ও বাক প্রতিবন্ধী বিশেষ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের এবং নভেম্বর মাসে সরকারি সেফ হোমের প্রতিনিধিদের বাংলা ইশারা ভাষা প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।
- সিলেট পুলিশ সুপারের আহবানে ২০১২ সাল থেকে পুলিশের ইন-সার্ভিস ট্রেনিংয়ে "প্রতিবন্ধিতা ও বাংলা ইশারা ভাষা" প্রশিক্ষণ প্রদান ধারাবাহিকভাবে অব্যাহত আছে।
- ২০১২ সালের নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে তিন দিনব্যাপী দুটি প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এই কর্মশালার বিষয় ছিল "প্রতিবন্ধিতা, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও বাংলা ইশারা ভাষা"। ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারের ৩৪ জন পুলিশ সদস্য, ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারের সহযোগী ১০টি এনজিও এবং সমাজসেবা অধিদফতরের ২০ জন কর্মকর্তা এই প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশ নেন।
- সমাজ সেবা অধিদফতরের আওতাধীন ফরিদপুর ও গাজীপুরের সেফ হোম, কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্র, মহিলা বিষয়ক অধিদফতরের আওতাধীন গাজীপুরের নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র এবং আইন ও সালিশ কেন্দ্রের সেফ হোমে শ্রবণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বাংলা ইশারা ভাষার দোভাষী সহায়তা দেয়া হয়। প্রতিবন্ধী মানুষের অধিকার অর্জনে ও তাদের উন্নয়নে বেশ কিছু পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন।
- প্রস্তাবিত 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অধিকার আইনে' নির্যাতিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সুরক্ষায় বিশেষ বিধান যুক্ত করা। বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিশেষ চাহিদাগুলো বিবেচনায় নিয়ে বিদ্যমান আইন এবং মানবাধিকার সুরক্ষার বিভিন্ন কার্যক্রম পর্যালোচনা ও সংশোধন করা, যাতে তাদের অধিকার রক্ষার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি হয়।
- প্রতিটি জেলায় 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সহিংসতা ও নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি' গঠন করা। 'জেলা নারী ও শিশু সহিংসতা ও নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি; এবং থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন পরিবীক্ষণ ব্যবস্থায় 'প্রতিবন্ধী নারী ও শিশুর অবস্থা' উপ-শিরোনামে উলে-খ করার পদ্ধতি দ্রুত চালু করা। পাশাপাশি, থানায় মামলা হয়নি এমন নির্যাতনের তথ্য সংগ্রহে বিশেষ উদ্যোগ নেয়া।
- প্রতিটি থানায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ডেস্ক চালু করে প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য বিশেষ পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, পুলিশ প্রধান কার্যালয়, সমাজসেবা অধিদফতর এবং জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদানকারী সংস্থা তাদের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কার্যালয়সমূহকে নির্যাতিত প্রতিবন্ধী মানুষকে সহায়তা প্রদানকারী বিশেষায়িত প্রতিবন্ধী মানুষের সংগঠন (ডিপিও) বা বেসরকারি সংস্থার তথ্য জানিয়ে রেফারেল পত্র পাঠানো।
- মহিলা অধিদফতর ও পুলিশ বিভাগের কর্মকর্তাদের মৌলিক ও কর্মকালিন স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণে প্রতিবন্ধী মানুষের অধিকারের বিষয়গুলো যুক্ত করা।
- ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারের গবেষণা সেলের মাধ্যমে নির্যাতিত প্রতিবন্ধী মানুষের বিশেষ প্রয়োজন বা নির্যাতনের ধরণ ও অপরাধ প্রবণতা নিয়ে গবেষণা পরিচালনা করা।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য পদ্ধতিগত ও বয়স-উপযোগী সুবিধাসহ সাক্ষ্যপ্রদান, তদন্ত ও প্রাথমিক পর্যায় থেকে শুরু করে সব আইনি কার্যপ্রণালীতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অংশগ্রহণ এবং সুবিচারপ্রাপ্তি নিশ্চিত করা।
- সব প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য জেলা আইনি সহায়তা তহবিলের সহায়তা নিশ্চিত করা এবং ইশারা ভাষা দোভাষী সহায়তার ব্যয় এই তহবিল থেকে মেটানোর ব্যবস্থা করা।
- বিচার প্রক্রিয়ায় শ্রবণ প্রতিবন্ধী মানুষের সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে আদালতে বাংলা ইশারা ভাষার দোভাষীর তালিকা প্রকাশের আবেদন জানাচ্ছি। বিচার কাজে ইশারা ভাষার দোভাষী কার্যক্রম পরিচালনার ব্যয়ভার আদালতকেই বহন করতে হবে।
- ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার, সেফ হোম ও ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারসহ সরকারের মানবাধিকার সহায়তা কার্যক্রমে ইশারা ভাষার দোভাষীসহ বিশেষায়িত সেবাপ্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে।

বি-স্ক্যান এর উদ্যোগে সেলাই মেশিন বিতরণ

স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বি-স্ক্যান এর স্বনির্ভর প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন জেলায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিভিন্ন সহায়ক উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে।

তন্মধ্যে উলে-খযোগ্য, গত ৩০ আগস্ট, ২০১৩ রাজশাহীর কল্পনা প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক ১০টি হিয়ারিং এইড ও বেশ কিছু সহায়ক উপকরণের আবেদনের ভিত্তিতে দুইজন শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীকে হিয়ারিং এইড দেয়া হয়েছে। লিয়ন ইন্টার ন্যাশনালের সহযোগিতায় রাজশাহীতে এই ১০ জন শ্রবণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির হিয়ারিং টেস্ট নেয়া হয়েছে। তবে বাকী ৮ জনের হিয়ারিং এইড ও অন্যান্য উপকরণের ফান্ড যোগার হলেই সেগুলোও পৌঁছে দেয়া হবে।

এছাড়া দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত ডিজেবল্ড রাইটস অরগানাইজেশন অব কিশোরগঞ্জ (ডিআরওকে) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্বনির্ভর করণের লক্ষ্যে একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খুলতে যাচ্ছে। তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে গত ২১ আগস্ট, ২০১৩ সেখানে দুটি সেলাই মেশিন প্রদান করা হয়।

কল্পনা প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থার হাতে ৪টি সেলাই মেশিন তুলে দিচ্ছেন সমানুপাতিক সদস্যগণ –অপরাজেয়

রাজশাহীতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা ও সহায়ক উপকরণ বিতরণ

অপরাজেয় ডেস্ক

রাজশাহী জেলায় পনেরো জন দরিদ্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য উন্নত সেলাই মেশিন প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করেছে রুয়েট শিক্ষার্থীদের দ্বারা পরিচালিত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সমানুপাতিক। এছাড়াও রাজশাহী কল্পনা উন্নয়ন প্রতিবন্ধী সংস্থাকে ৪ টি সেলাই মেশিন প্রদান করাসহ আরো দুইশতজন গরীব প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ঈদের দিন ভালো খাওয়া-দাওয়া নিশ্চিত করতে প্রত্যেককে পাঁচশ টাকার খাদ্যসামগ্রী ও নগদ অর্থ প্রদান করা হয় এক অনুষ্ঠানে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ছাড়াও সমানুপাতিক সদস্যবৃন্দ এবং এলাকার গন্যমান্য ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন উক্ত অনুষ্ঠানে।

'আসুন এই ঈদে দরিদ্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পাশে দাঁড়াই' স্লোগানকে সামনে রেখে গত রমজান মাসে তারা অত্র এলাকার 'কল্পনা উন্নয়ন প্রতিবন্ধী সংস্থা'র দরিদ্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়ে কাজ শুরু করে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক এবং রুয়েটে বিভিন্নভাবে প্রচারণা ছড়িয়ে পড়লে তাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে দেশের সর্বস্তরের মানুষ এবং প্রবাসীরা এগিয়ে আসেন আর্থিক সহযোগিতা দিতে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্বাবলম্বীকরনের লক্ষ্যে এই সেলাই মেশিন প্রশিক্ষণের জন্যে যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের একজন প্রশিক্ষককে নিয়োগ দিয়েছে সমানুপাতিক। যিনি পাঁচ মাসব্যাপী ১৫ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে নানা ধরনের সেলাই প্রশিক্ষণ দেবেন। পরবর্তীতেও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্বনির্ভর করণের লক্ষ্যে এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যহত রাখা যাবে এমনটাই বিশ্বাস তাদের। সমানুপাতিক সদস্যগণ জানান, প্রতিবন্ধী এবং অপ্রতিবন্ধী মানুষের জন্য একটি সম-অধিকার সম্পন্ন সমাজ গড়ে তোলা তাদের স্বপ্ন। দেশের উন্নয়নে উভয়ের সম্মিলিত অংশগ্রহণ তারা নিশ্চিত করতে চান।

আপনার প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের প্রতিবন্ধী বিষয়ক যে কোন কার্যক্রমের ছবি ও খবর পাঠিয়ে দিন অপরাজেয় -এর ঠিকানা

বিশ্ব সেরিব্রাল পালসি দিবস ২০১৩

● শারমিন রহমান (নিয়ন) ●

আগামি ২রা অক্টোবর, বিশ্ব সেরিব্রাল পালসি দিবস ২০১৩, "আইডিয়াস ফর চেঞ্জ" শিরোনামে উদযাপিত হতে যাচ্ছে। মূল উদ্দেশ্য বিশ্বময় সেরিব্রাল পালসি সম্পর্কে সচেতনতার মাধ্যমে তাদের জীবনমান উন্নত করা। সেরিব্রাল পালসি আক্রান্ত ব্যক্তি ও তাদের পরিবারবর্গের জন্য অনেক আশা ও সম্ভাবনার বার্তা নিয়ে এসেছে দিবসটি।

গত বছর ৪ঠা সেপ্টেম্বর বিশ্ব সেরিব্রাল পালসি দিবসের পদযাত্রা শুরু করে বিশ্বের ১৭ মিলিয়ন সিপি ব্যক্তিকে আশান্বিত করেছে। দিবস পালনের ধারণাটি আসে পঞ্চাশটি আন্তর্জাতিক সেরিব্রাল পালসি চ্যারিটি প্রতিষ্ঠানের একটি গ্রুপ থেকে। অস্ট্রেলিয়ার সেরিব্রাল পালসি এ্যালায়েন্স ও যুক্তরাষ্ট্রের ইউনাইটেড সেরিব্রাল পালসি, বিশ্ব সেরিব্রাল পালসি দিবসের মূল উদ্যোক্তা। ক্রমান্বয়ে আরো অনেক দেশের সেরিব্রাল পালসি সেবায় নিয়জিত প্রতিষ্ঠান এই ক্যাম্পেইনের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। এই বিশেষ দিনটির আয়োজনকারীরা ওয়ার্লড সেরিব্রাল পালসি ডে ২০১২ ওয়েবসাইটের মাধ্যমে, প্রথম বিশ্ব সেরিব্রাল পালসি দিবসটির থীম "চেঞ্জ মাই ওয়ার্লড ইন ওয়ান মিনিট" শিরোনামে সারা বিশ্বের সিপি ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে তাদের আইডিয়া দিতে অনুরোধ করে। এই সাইটটি সিপি আক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য একটি ফোরাম হিসেবে কাজ করে। যেখানে তাদের জীবনমান আরো উন্নত ও স্বাবলম্বি করে তুলতে স্বাধীন মত প্রকাশসহ তাদের দেওয়া পরিকল্পনাগুলোর বাস্তবায়নের সুযোগ পায় তারা। সাইটে প্রকাশিত সিপি ব্যক্তিদের পরিবারবর্গ ও বন্ধুদের দেয়া ব্যক্তিক্রমধর্মী মতামত তথা পরিকল্পনাগুলোর দ্বারা একজন সিপি ব্যক্তির সহজ চলাচল, স্বাবলম্বিতা অর্জন, প্রবেশগম্যতা, কথোপকথন বা সমাজে একীভূত হওয়ার জন্য বিভিন্ন আলোচনা-পরামর্শ তুলে ধরে সকলে। নির্ধারিত এক মিনিট সময় এর মধ্যে ভিডিও বা টেক্সট হিসেবেও পরিকল্পনা বা মতামতগুলো অনলাইনে প্রকাশ করার সুযোগ থাকে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে পাওয়া পরিকল্পনাগুলোর কার্যকারিতা বিচারে ভোটের মাধ্যমে পুরষ্কার প্রাপ্ত পণ্যটি নির্বাচিত করে। প্রথমবারের মত ওয়ার্লড সেরিব্রাল পালসি ডে ২০১২তে এই বিশেষ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ওয়েবসাইটে প্রকাশিত মোট চারশ পরিকল্পনার মধ্যে আলপার সির্জান নামে তুরস্কের একজন সিপি ব্যক্তির পরিকল্পনা শর্টলিস্টে নির্বাচিত হয়। যার ফলাফল ঘোষিত হয় গত ২৭ এপ্রিল, ২০১৩তে। উল্লেখ্য যে আলপার সির্জান একটি ব্যাটারি চালিত মোটরাইজড হুইলচেয়ার ব্যবহার করেন এবং তিনি সোলার পাওয়ারে চালিত হুইলচেয়ার তৈরির পরিকল্পনা জমা দেন। পরবর্তীতে ইউনিভার্সিটি অব ভার্জিনিয়ার একটি দল এর বাস্তব রূপ দিতে সক্ষম হন। চমৎকার একটি সৌরশক্তিতে চালিত হুইলচেয়ার বানিয়ে তারা ২৫০০০ ডলারের প্রথম পুরষ্কারটি জিতে নেন। আশা করা যাচ্ছে যে আগামী ওয়ার্লড সেরিব্রাল পালসি দিবসে হুইলচেয়ারটি বাজারে ছাড়া হবে। প্রতিযোগিতাটি সফল করার পিছনে সবার আন্তরিক সহযোগিতা এবং ইউনিভার্সিটি অব ভার্জিনিয়ার উদ্ভাবনকারি ছাত্রদের প্রচেষ্টায় তৈরিকৃত সোলার পাওয়ারে চালিত হুইলচেয়ারটি দ্বারা প্রমানিত হয় যে একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করলে আমরা সিপি ব্যক্তিদের জন্য একটি সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়তে পারবো।

এবারও ওয়ার্লড সেরিব্রাল পালসি ডে উপলক্ষ্যে গত ১৪ই জুলাই থেকে শুরু হয়েছে প্রতিযোগিতাটি। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত হতে অভিনব সব পরিকল্পনা জমা হচ্ছে সাইটটিতে। ২রা অক্টোবরে বিশ্ব সেরিব্রাল পালসি ডে উদযাপনের পরে নভেম্বর ও ডিসেম্বরে একটি গ্লোবাল ওয়ার্লড সিপি ডে প্যানেল বসবে যেখানে সবাই মিলে তিনটি পরিকল্পনাকে শর্টলিস্ট করবেন। ফেব্রুয়ারিতে উদ্ভাবক, গবেষক ও সমাজ সেবকদের আমন্ত্রণ জানানো হবে নির্বাচিত তিনটি পরিকল্পনার বাস্তবায়নের জন্য। ২১ জুলাই ২০১৪, প্রথম পুরষ্কার ঘোষনা দিয়ে ২০১৪ সালের ক্যাম্পেইন এর জন্য ওয়েবসাইট খোলা হবে।

সেরিব্রাল পালসি বা সিপি কোন রোগ অথবা অসুস্থতা নয়। এর প্রভাবে মানুষের চলাফেরায় শারীরিক অক্ষমতা প্রকাশ পায়। সাধারণত জন্মের পূর্বে অথবা পরে মস্তিস্কের কোন অংশের স্বাভাবিক বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত হলে সিপি হতে পারে। আক্রান্ত ব্যক্তি তাদের চলাফেরা এবং মৌখিক প্রকাশ ভঙ্গি নিয়ন্ত্রণ করতে কিছুটা অসুবিধার সম্মুখিন হন। এর অর্থ এই নয় যে, ঐ ব্যক্তি মানসিকভাবে প্রতিবন্ধী। সিপি আক্রান্ত কোন কোন ব্যক্তির জ্ঞান-বুদ্ধি একজন অপ্রতিবন্ধী ব্যক্তির চেয়ে অনেক বেশী হতে পারে। তাই তার এবং পরিবারের জন্য সামাজিক সচেতনতার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। কারণ পারিবারিক ও সামাজিক সহযোগিতায় তারা একটি কর্মঠো স্বাভাবিক জীবন যাপনের সুযোগ পান এবং মেইনস্ট্রিম সমাজে চলাচলে সক্ষম হন। প্রাথমিক পর্যায় থেকে বিশেষ শিক্ষা ও থেরাপি প্রদান করলে একজন সেরিব্রাল পালসি তে আক্রান্ত ব্যক্তির জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন আনা সম্ভব। বিশ্বে এমন অনেক সিপি ব্যক্তি রয়েছে যারা তাদের কাজের মাধ্যমে খ্যাতি অর্জন করতে পেরেছেন। আমাদের দেশেও বিশ্ব সেরিব্রাল পালসি দিবসকে কেবল সেমিনার, মিটিং ও র‌্যালিতে সীমাবদ্ধ না রেখে সারা বছর ধরে আমাদের কাজ করে যাওয়া উচিত। যাতে সিপি ব্যক্তির কর্মদক্ষতা বাড়িয়ে তাদের স্বাবলম্বি ও যতটা সম্ভব দক্ষ ব্যক্তিতে পরিণত করা যায়, যাতে পরিবার ও সমাজের বোঝা হয়ে নয় স্বাবলম্বী তথা সম্মানজনক জীবন যাপন করে দেশ ও জাতির উন্নয়ন সাধনে কাজ করে যেতে পারেন তারা। এটি আমাদের একে অপরের হাতে হাত মিলিয়ে সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই সম্ভব।

শারমিন রহমান (নিয়ন)
ফ্রিল্যান্স রাইটার ও অনুবাদিকা
ভলেন্টিয়ার টিচার
উইলিয়াম এন্ড মেরি টেইলর (ইনক্লুসিভ)স্কুল,

জানতে হবে

প্রতিবন্ধিতার সংজ্ঞা (বিভিন্ন আলোকে)

১. জাতিসংঘ প্রতিবন্ধী অধিকার সনদ-
সনদের ভূমিকার 'ঙ' নং অনুচ্ছেদ

প্রতিবন্ধিতা একটি বিকাশমান ধারণা এবং প্রতিবন্ধিতা হলো প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং তার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিগত ও পরিবেশগত বাধার মধ্যকার আন্তসম্পর্কের পরিণতি, যা অন্যান্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে সমাজে পূর্ণ ও কার্যকর অংশগ্রহণে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বাধাগ্রস্ত করে।

ধারা ১ (২নং অনুচ্ছেদ):

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ হলেন তারা, যাদের দীর্ঘ মেয়াদী শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিগত বা ইন্দ্রিয়গত অসুবিধা রয়েছে, যা নানান প্রতিবন্ধকতার সাথে মিলেমিশে সমাজে অন্যান্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে তাদের পূর্ণ ও কার্যকর অংশগ্রহণে বিঘ্ন ঘটায়।

২. ইন্টারন্যাশনাল ক্লাসিফিক্যাশন অব ফাংশনিং (আইসিএফ)

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ২০০১ সালে ইন্টারন্যাশনাল ক্লাসিফিক্যাশন অব ফাংশনিং (আইসিএফ) ডকুমেন্ট-এ প্রতিবন্ধিতার সংজ্ঞা প্রণয়নের জন্য একটি কাঠামো (ফ্রেমওয়ার্ক) নির্দেশ করেছে, যেটি জাতিসংঘের সদস্যভূক্ত প্রতিটি রাষ্ট্র তার নিজস্ব আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা বিবেচনায় রেখে আইনী সংজ্ঞা প্রণয়নকালে ব্যবহার করে। এ কাঠামোটিতে চারটি ক্ষেত্র রয়েছে যা নিচে বর্ণনা করা হলো-

স্বাস্থ্যগত অবস্থা/সমস্যা
(Health Condition)

- বিভিন্ন স্বাস্থ্য অবস্থা যেমন - পোলিও, কুষ্ঠ, রাতকানা রোগ, কানের সংক্রমণ, মস্তিষ্ক প্রদাহ, আহত হওয়া ইত্যাদিতে মানুষ আক্রান্ত হয়।
- এর কিছু সংখ্যক সংঘটিত হয় নানা ধরনের রোগ বা অসুস্থতা থেকে আবার কিছু হয় দূর্ঘটনা থেকে আবার কিছু জন্মগত বা বংশগত কারণে।
- অনেক ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যগত অবস্থা চিকিৎসা প্রদানের পরও অঙ্গহানি ঘটে।

অঙ্গের হানি/হীনতা/ ক্ষতিগ্রস্থতা
(Impairment)

- শরীরের কোন অঙ্গের হানি বা অঙ্গের ক্ষতিগ্রস্থতা, যেমন-একটি হাত না থাকা অথবা কানের পর্দা ক্ষতিগ্রস্থ।
- এটি শারীরিক বা মানসিক ক্ষতি বা সমস্যা/ অস্বাভাবিকতা হতে পারে।
- এটি সাময়িক বা স্থায়ী ক্ষতি বা সমস্যা হতে পারে।
- এটি হলো চিকিৎসাগত দিক (Medical aspect)-এর সাথে সম্পর্কিত।

কর্মকান্ড সম্পাদনে সীমাবদ্ধতা
(Activity Limitation)

- কর্মকান্ড সম্পাদনে সীমাবদ্ধতা হলো দৈনন্দিন জীবন যাপনে কার্যগত বা ব্যবহারিক সমস্যা। উদাহরণস্বরূপ- কাজ করা, স্কুলে যাওয়া, বাইরে ঘুরে বেড়ানো, দৈনন্দিন জীবনের কাজকর্ম-কাপড় পরা, খাওয়া, গোসল করা ইত্যাদিতে সমস্যা।
- অন্যান্য সমবয়সী বা সক্ষম সংস্কৃতির ব্যক্তিদের অনুরূপ উপায়ে ব্যবহারিক কাজ সম্পাদন করতে না পারা।
- এটি হলো ব্যবহারিক দিক (Practical aspect) এর সাথে সম্পর্কিত।

অংশগ্রহণে বাধা
(Participation Restriction)

- প্রতিবন্ধকতা হলো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমবয়সী এবং সমসামাজিক পটভূমিকার ব্যক্তিদের ন্যায় সামাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের সুযোগের অভাব, যেমন:
  -পারিবারিক বা সামাজিক জীবনে ভূমিকা রাখার সুযোগের অভাব;
  -পারিবারিক, সামাজিক, ধর্মীয় কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করার সুযোগের অভাব;
  -প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির অভাব-পলিসি, কর্মসূচী থেকে বাদ দেওয়া, পলিসি তৈরীতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অংশগ্রহণের সুযোগের অভাব;
- বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের প্রতিবন্ধকতাসমূহ সৃষ্টি হয় মানুষের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব এবং অজ্ঞতা থেকে।
- এটি হলো সামাজিক দিক (Social aspect) এর সাথে সম্পর্কিত।

অদম্য

অনুপ্রেরণার অন্য নাম শিউলী সাথী

জীবন আপন গতিতে চলে। সেই গতির সাথে তাল মিলিয়ে যারা জয়ী হয়েছেন তাদের একজন শিউলি সাথী। জন্মের পর ১৫ বছর পর্যন্ত দাঁড়ানোর শক্তি পাননি পায়ে। হাটতে পারতেন না বলে অনেক অবজ্ঞা-গঞ্জনার মাঝে বেড়ে উঠেছেন। মগবাজারের প্রতিবন্ধী স্কুল এসডাব্লি-উআইচি বা 'সুইড বাংলাদেশ' -এ ভর্তি হয়ে ঘুরে যায় জীবনের মোড়। সেখানেই শেখেন হাঁটা-চলা। শেখেন খেলাধুলা। হয়ে ওঠেন খেলোয়াড়। শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকে টপকে বিশেষ অলিম্পিকে ২০০৭ ও ২০১১ সালে বচি আর ব্যাডমিন্টনে সোনা, রূপা এবং ব্রোঞ্জ পদক জিতে বিরল সম্মান বয়ে আনেন দেশের জন্যে। বাংলাদেশকে তুলে ধরেন বিশ্বব্রহ্মান্ডে।

এরপরেও ভাগ্যের চাকা সেভাবে ঘোরেনি। বাংলাদেশ সরকার ২০০৭ সালে একটি সংবর্ধনায় অ্যাথলেটদের কিছু টাকা দেয় এবং ২০১১ সালে শুধুমাত্র একটি ট্রাকস্যুট দেয়। নিয়তি বড় নির্মম। বিশ্বজয়ী সাথীর নিত্য সঙ্গী অভাব যেন কিছুতেই পিছু ছাড়ে না। ঢাকার ধুপখোলার একটি বস্তিতে বাবা-মাকে নিয়ে থাকেন। বাবা অসুস্থ। পরিবারে সাথীই একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। তার সাবেক শিক্ষাপ্রাঙ্গন 'সুইড বাংলাদেশ'-এ বর্তমানে বাচ্চাদেরকে নাচ-গান শেখান। বেতন হিসেবে পান মাত্র আঠারো'শ টাকা যা তিন সদস্যের পরিবারের একমাত্র সম্বল। ভেবে পান না সামান্য এই টাকায় কিভাবে বাবা-মার ওষুধ পথ্য যোগাবেন আর কিভাবেই বা ঘর ভাড়া দেবেন।

বাংলাদেশ বিশেষ অলিম্পিক দলের প্রশিক্ষক কাজী বিলকিস একসময় সাথীর শিক্ষকও ছিলেন। সাথীর বর্তমান পরিস্থিতি জেনে তিনি বিশেষ অলিম্পিক কর্তৃপক্ষের পক্ষে গ্রামীণফোনের 'চলো বহুদূর' এ সাথীর গল্প পাঠান।

গ্রামীণফোন কর্তৃক নির্বাচিত এই গল্পটি নিয়ে বিজ্ঞাপন নির্মিত হলে দু'লক্ষ টাকা পান সাথী। কাজী বিলকিসের কাছে জানা যায়, গত জুনে প্রধানমন্ত্রী এক অনুষ্ঠানে ২০১৩ সালের বিশেষ অলিম্পিকে ফ্লোর হকিতে অংশ নেয়া ১৪ জন অ্যাথলেট আর ৩ জন কোচকে এক লক্ষ করে টাকা দিয়েছেন এবং ২০০৭ ও ২০১১ সালের ভালো ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শনকারী অ্যাথলেটদের নামও চেয়েছেন। তাই তিনি নিজ উদ্যোগে সেখানে সাথীর নাম পাঠিয়েছেন যদিও এখনো কিছু জানা যায়নি বলে জানান।

Best Wishes to OPORAJEYO

EASTERN
MEDICAL COLLEGE

"we care for your life
we share with your dream"

Kabila, Dhaka-Chittagong Highway
Burichong, Comilla. Cell : 01711572079

স্টেম সেল গবেষণা : মেরুদন্ডে আঘাতপ্রাপ্ত রোগীদের জন্য আশার আলো

শারমিন আকতার

কানাডার টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ে চলছে একটি যুগান্তকারী গবেষণা যাতে মেরুদন্ড ও ডিস্কে আঘাতপ্রাপ্ত রোগীদের চিকিৎসা ব্যবস্থায় সুফল বয়ে আনবে। কানাডিয়ান চিরোপ্রাকটিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন (সিসিআরএফ)-এর ডিস্ক জীববিদ্যার অধ্যাপক ড. মার্ক এরউইন এই গবেষক দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

মানুষের আন্তঃমেরুদন্ডে ডিস্কের স্টেম সেল পুনরায় উৎপাদিত হওয়ার বৈশিষ্ট্য উদ্ঘাটিত করার মিশন নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন তারা। তাতে ডিস্ক ক্ষয় রোগ এবং মেরুদন্ডে আঘাতের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে চিকিৎসার জন্য বিশেষ আশাবাদের লক্ষণ ইতোমধ্যে প্রমাণিত। শরীরের এইসব কর্মক্ষমতা বিনাশকারী এবং যন্ত্রণাদায়ক অবস্থা ভালভাবে বুঝতে ড. এরউইন একটি প্রচেষ্টা চালান। তিনি একটি মাল্টি ডিসিপ্লিনারি ডিস্ক জীববিদ্যা রিসার্চ গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করেছেন: এতে একই সঙ্গে নিউরো সার্জারি, বাতরোগ সংক্রান্ত বিজ্ঞান এবং সেলুলার ও আণবিক জীববিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করা হয়। ড. এরউইন ও তার দল আন্তঃমেরুদন্ডের ডিস্কের মধ্য থেকে নটোকর্ডাল ও পরিণত স্টেম সেল বিচ্ছিন্ন করেন। তারপর অল্প অক্সিজেন বিশিষ্ট অবস্থায় সেগুলোর উন্নয়ন ও বিকাশ ঘটান। এতে দেখা যায় স্টেম সেলগুলোর পুনরায় উৎপাদিত হওয়ার ক্ষমতা আছে ও সেগুলো বিভিন্ন ধরনের কারটিলেজ, হাড়, টিস্যু এবং অন্যান্য বিশেষ ধরনের কোষ হিসেবে পৃথক হয়ে বিকশিত হতে পারে। দলের প্রাথমিক গবেষণার মাধ্যমে তারা জানতে পারেন যে, আন্তঃমেরুদন্ডের ডিস্ক থেকে প্রাপ্ত স্টেম সেলগুলো পরবর্তীতে স্নায়ু কোষ হিসাবে ডিফারেন্সিয়েট করতে সম। সম্প্রতি তারা গবেষণা করার পর জানিয়েছেন, পরীক্ষাগারে তারা ডিস্ক কোষের মৃত্যু স্থগিত করাতে ও তাদের ফাংশন সংরক্ষণ করতে পারেন। পাশাপাশি এমন কিছু আশার কথাও বলেন যেগুলো অসম্ভব বলে মনে করা হত।

এখনও পর্যন্ত মূলত গবেষণাগারে প্রাথমিক পর্যায়ে ক্ষুদ্র প্রাণীর ওপর পরীক্ষণ চালানো হচ্ছে। অবশ্য যদি মেরুদন্ড আঘাত ও ডিস্ক অধঃপতনের জন্য সফল একটি চিকিৎসার উদ্ভব ঘটে তাহলে রোগীর নিজের স্টেম সেল তাদের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হতে পারবে যা সত্যিকার অর্থেই নিজের উদ্ভাবিত ওষুধের মতই। চিন্তা করা হচ্ছে যে প্রথমে রোগীর ডিস্কের আঘাতপ্রাপ্ত অংশ থেকে তার স্টেম সেল নিষ্কাশন করা হবে ও তারপর সেটাকে এক ধরনের স্নায়ু বা ডিস্ক কোষে পুনর্জন্ম করাতে হবে এবং তারপর শরীরের যেখানে মেরামতের প্রয়োজন বোধ করা হবে সেখানে সেই কোষকে আবার পুনরায় স্থাপন করা হবে। একটা মানুষ যতটা চিন্তা করতে পারে তার চেয়েও অনেক দ্রুত গতিতে বিজ্ঞান মানুষের সঙ্গে আরও বেশী ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে যাচ্ছে সহজলভ্য থেরাপির সম্ভাবনাকে সাথে নিয়ে।

কোষের টিকে থাকার ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সেলুলার পরিবেশ উদ্ধারের ক্ষেত্রে যেসব প্রধান অন্তর্নিহিত সমস্যা রয়েছে সেগুলোর জন্য প্রধান সেলুলার বা আণবিক চিকিৎসার উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই গবেষণা একটি বিরাট দিগন্ত উন্মোচন করেছে। রোগীদের জন্য জীবন যাপনের মানের সম্ভাবনা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করেছে। তাদের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি ও ব্যাথা কমিয়ে দিয়ে, এমনকি আঘাতপ্রাপ্ত বা অসুস্থ্য টিস্যুর পুনর্জন্মের মাধ্যমে এই সম্ভাবনা বাড়িয়ে দিয়েছে।

চিরোপ্রাক্টর (Chiropractor), ড. এরউইন ১৯৮৪ সাল থেকে এই অবস্থার প্রভাব সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ করে যাচ্ছেন। তিনি সাপ্তাহিক ভিত্তিতে একটি টরেন্টো ওয়েস্টার্ন হসপিটালে স্পাইন ক্লিনিকে তার রোগীদের ওপর তার ব্যক্তিগত অনুশীলন করে যাচ্ছেন। তিনি টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয় এবং টরেন্টো ওয়েস্টার্ন হসপিটালের সার্জারি বিভাগের অর্থোপেডিক এবং নিউরোলজিকাল সার্জারি ডিভিশনের অধ্যাপক। ২০০৪ সালে তিনি টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁর পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করেন এবং তখন থেকে তার বিভিন্ন ধরনের অগ্রদূতমূলক পর্যালোচনা ও গবেষণাপত্র প্রকাশ হতে থাকে; যেগুলো কানাডিয়ান ইন্সটিটিউট অব হেলথ রিসার্চ (সিআইএইচআর), কানাডিয়ান আর্থরাইটিস নেটওয়ার্ক এবং এও-স্পাইন নর্থ আমেরিকা এবং এও-স্পাইন ইন্টারন্যাশনাল কর্তৃক পুরস্কৃত হয়েছে।

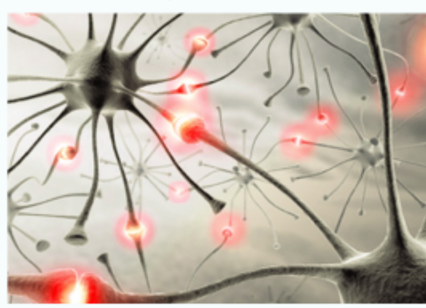

ড. এরউইন তার এই গবেষণার মাধ্যমে মেরুদন্ডে আঘাত বা অধঃপতনমূলক পরিবর্তনের ফলে যেসব রোগীরা কষ্ট ভুগছেন সেইসব আক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য নতুন আশার উদয় ঘটিয়েছেন।

বিদেশী লেখা থেকে অনুবাদ
শারমিন আক্তার

স্মরণ

এক উজ্জ্বল নক্ষত্রের নাম মরহুম মো. মাহবুবুল আশরাফ

আজমল হোসেন মামুন

গত ৫ সেপ্টেম্বর ছিলো জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফোরাম (এনএফওডব্লি-উডি) এর সহ-সভাপতি, এ্যাসোসিয়েশন ফর দ্যা ওয়েল ফেয়ার অব দি ডিজএ্যাবল্ড পিপল (এডব্লি-উডিপি) এর সেক্রেটারী, বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যাণ সমিতি (বিপিকেএস) এর সাবেক সহকারী পরিচালক, বি-স্ক্যান এর অন্যতম উপদেষ্টা, বিশিষ্ট প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক উন্নয়নকর্মী, গবেষক এবং অনুবাদক মোঃ মাহবুবুল আশরাফ ভাইয়ের তৃতীয় মৃত্যুবার্ষিকী।

যিনি ছিলেন এক উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত। তার সংস্পর্শে আসা যে কোন প্রতিবন্ধী বা অ-প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করতে বাধ্য হবেন তার পরোপকারী, বিনয়-নম্র, শান্ত স্বভাবের কথা। আমৃত্যু প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে যাওয়া এই মানুষটি সম্বন্ধে আজও বাংলাদেশের সবার ধারণা ইতিবাচক। যে কোন পরিস্থিতিতে তাদের পক্ষে কথা বলেছেন। কারো বিপদ দেখলে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে দ্বিতীয়বার চিন্তা না করে এগিয়ে গেছেন নিজের পকেটের টাকা খরচ করে হলেও।

১৯৮২ সালে আর্টিওভেনাস ম্যালফরমেশেন (Arteriovenus Malformation) নামে মেরুদন্ডের একটি দুরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত হয়ে তরুণ বয়সেই প্রতিবন্ধিতার শিকার হবার পরে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিলেন সব কিছু থেকে। সিআরপি (সেন্টার ফর দ্যা রিহেবিলিটেশেন অব দ্যা প্যারালাইজড) এ সিস্টার ভ্যালেরি টেইলরের অনুপ্রেরণায় তৎকালীন অস্থায়ী বিল্ডিং এর সিআরপিতে কর্মজীবন শুরু করেন তিনি। এরপরে আর থেমে থাকে নি তাঁর পথচলা।

১৯৯৪ সাল থেকে ২০০০ পর্যন্ত তিনি ভলান্টারি হেলথ সার্ভিসেস সোসাইটি (VHSS) নামক হেলথ নেটওয়ার্কিং অর্গানাইজেশেন দীর্ঘ ৭ বছর কাজ করেন এবং একই সাথে তিনি ম্যানেজমেন্টে পোস্ট গ্র্যাজুয়েশেন করেন। এরপরে ২০০১ - ২০০৩ বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যাণ সমিতিতে সহকারী পরিচালক এবং প্রতিবন্ধী উন্নয়ন প্রকল্পের বিভাগীয় প্রধান হিসেবে কাজ করেছেন। এই অফিসটি শাহবাগ থেকে দূরে চলে গেলে তিনি ফ্রীল্যান্স ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কার হিসেবে কাজ করতে থাকেন। ভিএইচএসএস এ থাকা কালীন তিনি একটি রিসোর্স নেটওয়ার্ক

গড়ে তোলেন। প্রতিবন্ধী মানুষ এবং প্রতিবন্ধী মানুষের উন্নয়নে যে সব প্রশিক্ষক, থেরাপিস্ট ও রিসোর্স পারসনরা আছেন তাদের সাথে অভিভাবকদের যোগাযোগ ঘটিয়ে দেয়ার লক্ষ্যে তাঁরই উদ্যোগে গঠিত হয় এসোসিয়েশেন ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট অব দ্য ডিজেবেল্ড পিপল (এডব্লি-উডিপি)।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আন্দোলনকে বেগবান করার জন্য 'স্পন্দন' নামে একটি ত্রৈমাসিক ম্যাগাজিন প্রকাশের উদ্যোগও নিয়েছিলেন। যেখানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়ে নানা খবর, প্রবন্ধ, ফিচারসহ অনেক তথ্যবহুল লেখা প্রকাশিত হতো বলে ম্যাগাজিনটির প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী এবং তাদের অভিভাবকরা। এছাড়াও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নে ৩টি গ্রন্থ অনুবাদ করেন তিনি। তার মধ্যে ইউএন এসকাপ কর্তৃক গৃহীত এশীয় এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের জন্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দশক, ২০০৩-২০১২ 'বিওয়াকো মিলেনিয়াম ফ্রেমওয়ার্ক ফর একশন-এর প্রাথমিক অনুবাদ অন্যতম। এছাড়া তার লেখা প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক অসংখ্য প্রবন্ধ এবং ফিচার জাতীয় দৈনিক পত্রিকা এবং ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছে।

জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরামসহ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিভিন্ন সংগঠন এবং বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে কাজ করার চেষ্টা করতেন তিনি। সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের একত্রিত করে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। মৃত্যুর মাত্র কয়েক মাস পূর্বে জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরামের সহ সভাপতি নির্বাচিত হন তিনি।

কিন্তু আমাদের দূর্ভাগ্য সেখানে কাজ করা শুরুর আগেই জন্ডিস এ আক্রান্ত হয়ে দীর্ঘ তিন মাস ভোগার পর ৫ সেপ্টেম্বর ২০১০ এ পিজি হাসপাতালে মাত্র ৪৫ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এ দেশের প্রতিবন্ধী মানুষকে তাঁর আরো অনেক কিছু দেবার ছিল। এ অপ্রত্যাশিত মৃত্যুতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে যে ক্ষতি হয়েছে তা সত্যিই অপূরণীয়।

আজমল হোসেন মামুন
সহকারী শিক্ষক
হারমনি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়
গাবতলা মোড়, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

কবিতা

স্মরণে : মো. মাহবুবুল আশরাফ

সালাউদ্দীন আহমেদ

আমার প্রিয় মুখটা দেখি
সাঁঝ আকাশে দোলে
আমার প্রিয় মুখটা দেখি
জোসনা রানীর কোলে।

আমার প্রিয় মুখটা দেখি
ফুল-পাখিদের ভিড়ে
আমার প্রিয় মুখটা দেখি
নদীর তীরে তীরে,
আমার প্রিয় মুখটা দেখি
সূর্য হয়ে উঠে
আমার প্রিয় মুখটা দেখি

গোলাপ হয়ে ফোটে
আমার প্রিয় মুখটা যেন
বট বৃক্ষের ছায়া,
আমার প্রিয় মুখটা যেন
হৃদয় জুড়ে মায়া,
আমার প্রিয় মুখটা যেন
নদীর বুকে ঢেউ

আমার প্রিয় মুখটা যে কি
জানো কি তোমরা কেউ?
আমার প্রিয় মুখটা ছিল
মাহবুবুল আশরাফ
প্রার্থনা করি আল-হ তুমি
করো তাঁকে মাফ।

গল্প

জীবনে ফুল ফোটা হলে মরণে ফল ফলবে

সেলিমা শারমীন ফারজানা রন্নমা

কর্মক্ষেত্রে প্রতিদিন অনেক ফোনকল রিসিভ করি। কলগুলো দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে এবং কখনো কখনো দেশের বাইরে থেকেও আসে। প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে ফোন রাখার পরে ঐ প্রান্তে যার সাথে কথা বলি তাকে আর মনে থাকে না। কিন্তু কিছু কিছু মানুষ ব্যতিক্রম! ফোন রাখার পরেও রেশ রয়ে যায়, আরো কিছু জানতে ইচ্ছে করে।

তেমনি একজনের কথা আজ আপনাদের বলব। তিনি ফোন করেছিলেন আজ থেকে বেশ ক'বছর আগে। হুইলচেয়ার ঠিক করাবেন। আমি সবিস্তারে সব তথ্য দেবার পর ফোন রেখে দিলাম যথারীতি। কিন্তু ফোন রাখার পরে মনে হতে লাগল ঐ কণ্ঠে কি যেন ছিল! কাজের ফাঁকে বসে বসে ভাবতে লাগলাম আবার যেন তিনি ফোন করেন। কেন যেন তার সম্পর্কে জানার প্রবল ইচ্ছে কাজ করছে মনে। ক'দিন পরেই কাঙ্খিত সেই ফোন। প্রবল উৎসাহে কথা শুরু করলাম আমি।

নাম ঠিকানা বিস্তারিত জেনে নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম,
-হুইলচেয়ার কার জন্য?
-"আমার নিজের জন্য"।

উত্তরটা শুনে অবাক হলাম। সাধারণত আমি যে সব কল রিসিভ করি সেগুলো কোন প্রতিষ্ঠান বা অভিভাবক নিজেই হুইলচেয়ার সম্পর্কে খোঁজখবর নেন। কোন হুইলচেয়ার ব্যবহারকারী নিজে তার হুইলচেয়ার সম্পর্কে জানার জন্য এই প্রথম ফোন দিলেন! আমার আগ্রহ আরো বেড়ে গেলো। কি করেন জানতে চাইলাম। উত্তর এলো
-'কিছু করি না'।
-ওহ্ আচ্ছা, তাহলে পড়াশোনা করেন বুঝি?
-'নাহ্ পড়াশোনাও করি না'।

নির্লিপ্ত কণ্ঠস্বর, কথাবার্তার ধরণে বেশ ম্যাচিউরড একজন মানুষ বলেই মনে হচ্ছে। যা আমাকে আরো আগ্রহী করে তুলছে। আমি বলি,
-পড়াশোনাও করেন না, চাকরীও করেন না তাহলে সারাদিন কি করেন?
-'টিভি দেখি, খাই আর ঘুমাই'।

সেই একি ঠান্ডাস্বর। প্রথম পরিচয়। তবুও ভদ্রতার সীমা ছাড়িয়ে জিজ্ঞেস করি
-বয়স কত আপনার?
-'ছত্রিশ বছর'।

অকপট স্বীকারোক্তি। উত্তর শুনে মাথাটা গরম হয়ে উঠে। আমার কণ্ঠ থেকে কেমন যেন উষ্মা ঝরে পড়ে। ভদ্রতার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছি এই কথা মনে রাখতে ইচ্ছে করে না। বলেই ফেলি,
-ছত্রিশ বছর হয়ে গেল! কিছুতো শুরুই করেননি আর কবে করবেন?
-'করব'।

সেই একি নির্লিপ্ত জবাব। আমার মুখ ফসকে বেড়িয়ে যায়,
-আর কবে করবেন! ঘর সংসারও করেন না, সারাদিন সময় কাটান কিভাবে? বাইরে ঘুরে বেড়ান নিশ্চয়।
-'নাহ্ কোথাও যাই না সারাদিন ইট পাথরের চার দেয়ালের ভিতরে বসে থাকি। বাইরে যেতে ইচ্ছে করলেও যেতে পারি না। হাঁটতে না পারলে কে নিয়ে যাবে? হুইলচেয়ার নিয়ে বাইরে বেড়াতে যাওয়া অনেক ঝামেলা'।
-কি হয়েছিল? হুইলচেয়ার ব্যবহার করেন কেন?
-"পোলিও। তিন/চার মাস বয়সে অসুখ ধরা পড়ে। মুক্তিযুদ্ধের সময় কোথায় ডাক্তার কোথায় বৈদ্য তবুও চিকিৎসার কোন ত্রুটি করেননি বাবা মা। কিন্তু এই জীবনে আমি দুই পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াতেই পারলাম না। তাই হাঁটতেও শিখিনি। চারপাশে এতো মানুষ হেঁটে বেড়ায় অথচ আমি? জানতেই পারলাম না হাঁটার অনুভূতি কেমন। এই বছর দু'য়েক হল একটা হুইলচেয়ার কেনা হয়েছে"।
-এত বছরেও কেনো হুইলচেয়ার কেনেননি?
-"আগে ভাড়াবাসায় থাকতাম ওখানে এতো ছোট ছোট রুম ছিল যে হুইলচেয়ার নিয়ে চলাফেরার মত জায়গা ছিল না। এখন নিজেদের বাড়িতে উঠে এসেছি। হুইলচেয়ার নিয়ে এই রুম ঐ রুমে ঘুরতে পারি।
-হুইলচেয়ার ছাড়া আগে কিভাবে চলাফেরা করতেন !?
-আগে সারাটাদিন এক জায়গাতেই বসে থাকতে হত। বিছানা বা সোফা যেখানে বসিয়ে রাখত মা সেখান থেকে আরেকবার সরিয়ে না নেয়া পর্যন্ত অনেকটা স্ট্যাচুর মত বসেই থাকতাম"।

এই প্রথম কারো কণ্ঠে এতোটা আত্মতৃপ্তির স্বর শুনতে পেলাম; যে কিনা হুইলচেয়ার পেয়ে কিছুটা হলেও স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছে। কথাগুলো শুনে আমার মন কেমন কেমন করে। বিরক্তিভাবটা আস্তে আস্তে কমে আসে। আমি বলি,
-আচ্ছা তাহলে তো আপনি ঘরে বসে গল্প উপন্যাস লিখতে পারেন।
-"গল্পের বই পড়ি কিন্তু লিখতে ভাল লাগে না"।
-'ঠিক আছে গল্প লিখতে ভাল না লাগলে সারাদিন যে ভাবে সময় কাটান সেটাই না হয় লিখতে শুরু করেন। এ্যানফ্রাঙ্কের ডায়রির মত আপনার লেখাও বিখ্যাত হয়ে উঠবে'।
-"আমার লেখার মত কোন বিষয়ই নাই। কি নিয়ে লিখব শুধু শুধু! তাছাড়া বানিয়ে বানিয়ে গল্প লিখব সেই ক্ষমতাও আমার নেই"।

আমি তবুও হাল ছাড়ি না। নাছোড়বান্দার মত বলতেই থাকি...কিন্তু তার এক কথা,
-"কি হবে এইসব ছাইপাশ লিখে?"

"আমি 'হাল ছেড়ো না বন্ধু আমার' এই পুরোনো বাক্যে নতুন করে উজ্জীবিত হয়ে আশায় থাকতে থাকতে অপেক্ষার প্রহরকে দীর্ঘ থেকে আরো দীর্ঘায়িত করতে থাকি। দিন যায় মাস যায় আমাদের বন্ধুত্ব গাঢ় থেকে গাঢ়তর হতে থাকে। তারপর হঠাৎ একদিন ফোন; ওপ্রান্তে লাজুক লাজুক স্বর, অবশেষে ও লিখতে শুরু করেছে। প্রথম পাঠক আমি। অবশ্য পাঠক না বলে শ্রোতা বলাই ভাল"

-মানুষ জানবে দিনের পর দিন চারদেয়ালের ভিতর বসে থাকতে কেমন লাগে। এই যুগেও কেউ এই ভাবে থাকে?
-"করব... করব... আমিও কিছু করব সময় তো চলে যায়নি"।

তার আত্মবিশ্বাসী কণ্ঠস্বর শুনে আমার বিস্ময়ের ঘোর কাটে না। মনে মনে ভাবি এতোটা বছর পার হয়ে গেল কিছু শুরুই করেননি; আর কবে যে করবেন! এ ছিল আমাদের দু'জনের প্রথম দিককার ফোনালাপ। এরপর প্রায়ই কথা হয়। আমাদের সম্পর্ক আপনি থেকে তুমিতে নেমে এসেছে। তার সারাদিনের গল্প শুনি। আমিও আমার অফিসের রোজকার হাসি ঠাট্টা কিংবা কারো সাথে রাগারাগির ইতং বিতং সব গল্পকথা শেয়ার করি তার সাথে। তবে এর মধ্যেও মাঝেমাঝে মিনমিন করে জানতে চাই লেখালেখির কি অবস্থা!
উনি টেনেটেনে বলেন, "হবে... হবে... "

আমি "হাল ছেড়ো না বন্ধু আমার" এই পুরোনো বাক্যে নতুন করে উজ্জীবিত হয়ে আশায় থাকতে থাকতে অপেক্ষার প্রহরকে দীর্ঘ থেকে আরো দীর্ঘায়িত করতে থাকি। দিন যায় মাস যায় আমাদের বন্ধুত্ব গাঢ় থেকে গাঢ়তর হতে থাকে। তারপর হঠাৎ একদিন ফোন; ওপ্রান্তে লাজুক লাজুক স্বর, অবশেষে ও লিখতে শুরু করেছে। প্রথম পাঠক আমি। অবশ্য পাঠক না বলে শ্রোতা বলাই ভাল। যেহেতু ওর কাছ থেকে দূরে থাকি তাই লেখাটা ও আমাকে ফোনে পড়ে শোনাল। আমি ওর লেখা শুনে যতটা আনন্দিত হলাম তার চেয়ে বেশী পুলকিত হলাম এই ভেবে যে, ও শুরু করেছে! তারও চেয়ে বেশী অবাক হলাম এই কথাটা চিন্তা করে যে, চাইলে ছত্রিশ বছরেও শুরু করা যায়। এখন শুধু লেগে থাকার পালা। ইতিমধ্যে ওর হাতের নাগালে কম্পিউটার, ইন্টারনেট সংযোগ চলে এসেছে। গাড়িও কেনা হয়েছে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে পৃথিবী চলে এসেছে হাতের মুঠোতে। ফেসবুক, টুইটার, মাইস্পেস, ইয়াহু ম্যাসেঞ্জারে একাউন্ট খুলল ও। তৈরী হল অনেক দেশী বিদেশী বন্ধু। এমনি করে ফেসবুকের মাধ্যমে পরিচিত হল সমমনা আরো ক'জনের সাথে। স্বপ্ন দেখতে শুরু করল আমার বন্ধুটি। যেহেতু সে নিজে নিজে বাইরে যেতে পারে না তাই অনলাইনের মাধ্যমেই একটি গ্রুপ খোলার চেষ্টা করল। যারা বিশেষভাবে সক্ষম মানুষদের বঞ্চনা, চাহিদা, সুযোগ সুবিধা আর অধিকারের বিষয়গুলো নিয়ে জনসচেতনতা তৈরী করার লক্ষ্যে কাজ করবে। অনলাইনে কাজ করতে করতে গ্রুপে মেম্বার সংখ্যা অনেক বেড়ে গেল। গ্রুপের লোগো, ওয়েবসাইট তৈরী হল। এই ভাবে কাজে কাজে একটি বছর পেরিয়ে গেল।

প্রথম বছরপূর্তিতে সিদ্ধান্ত হল অনলাইনে যে সব সদস্যদের সহযোগিতায় আমার বন্ধুটি গ্রুপের কাজ এগিয়ে নিয়েছে; তাদের সবাইকে নিয়ে গেটটুগেদারের আয়োজন করা হবে। নির্দিষ্ট দিনে দূরদুরান্ত থেকে সবাই এলো। একজন আরেক জনের সাথে পরিচিত হল। এবং সেখানেই সবার মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত হল শুধু মাত্র অনলাইনে গ্রুপের কাজ সীমাবদ্ধ না রেখে মাঠ পর্যায়েও কাজ করতে হবে। তাহলেই অনেক বেশী করে উপকৃত হবে সুবিধা বঞ্চিত মানুষ গুলো। যেই ভাবা সেই কাজ। সদস্যদের ভিতর থেকে অনেকেই স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে মাঠ পর্যায়েও কাজ করতে এগিয়ে এলো। তাদের নিয়ে আমার বন্ধুটি বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আয়োজন করল রচনা, বির্তক প্রতিযোগিতা, র‌্যালী, মানববন্ধন, মুক্তালোচনা, জনমত গঠনে স্বাক্ষরতা সংগ্রহের কাজ। বিতরণ করা হল লিফলেট। ছাপা হল স্বরণিকা, পোস্টার। তৈরী করল তথ্যচিত্র। সুবিধা বঞ্চিত মানুষদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে রেডিও টিভিতে বিভিন্ন টকশোতে অংশগ্রহন করে জনমত গঠনে সোচ্চার ভূমিকা রাখল। আর এই সব কাজের উদ্দেশ্য ছিল একটাই ভিন্নভাবে সক্ষম মানুষগুলো যেন তাদের মৌলিক মানবিক অধিকার সমাজের আর দশ জন মানুষের মতই পূরণ করতে পারে। তাদের জীবনের "না" গুলো যেন "হ্যাঁ" তে রূপান্তরিত হয়।

এতো পরিশ্রমের ফলাফলও পাওয়া যেতে লাগল আস্তে আস্তে। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বাসস্থান, কর্মস্থল, শপিংমল, যাদুঘর, স্টেডিয়ামে চলছে সিঁড়ির পাশাপাশি ঢালুরাস্তা বা র‌্যাম্প তৈরীর কাজ। যাতে যে কোনো ধরণের সহায়কদ্রব্য নিয়েও সহজে চলাচল করা যায়। বাসগুলোতে কি করে র‌্যাম্প বসানো যায় সে ব্যাপারেও চলছে পরীক্ষা নিরীক্ষা। আমাদের দেশে বিশেষচাহিদা সম্পন্ন মানুষদের জন্য ব্যবহারোপযোগী টয়লেট নেই; সে দিকেও মনোনিবেশ করা হচ্ছে। বর্তমান ডিজিটাল যুগে আইটি সেক্টরে কি করে বিশেষভাবে সক্ষম মানুষদের প্রবেশোপযোগী করে গড়ে তোলা যায় সে বিষয়েও দেয়া হচ্ছে ওরিয়েন্টেশন, ট্রেনিং। আর এই সব কিছুর পিছনে আমার বন্ধুটি অনলাইনে তৈরী হওয়া তার স্বেচ্ছাসেবী সদস্যদের নিয়ে টুকটুক করে এগিয়ে চলছে। বিশেষভাবে সক্ষম মানুষদের জন্য গড়ে তুলছে একটি সুন্দর আগামী।

যে মানুষটি কখনো চারদেয়ালের বাইরে পা বাড়ায়নি; বাড়ির বাইরে কখনো কথা বলেনি - সে আজ কি না করছে! দেশে বিদেশে আজ অনেকেই তাকে চেনে। ভাবা যায়? আমি আর কি বলব! নিজের চোখেই তো দেখছি!! চাইলে ছত্রিশ বছরেও শুরু করা যায়!

প্রয়োজন? প্রয়োজন শুধু একটু অনুপ্রেরণা আর সহযোগিতা...

সেলিমা শারমীন ফারজানা রন্নমা,
পক্ষাঘাতগ্রস্তদের পুনর্বাসন কেন্দ্র (সিআরপি),
নির্বাহী সদস্য, বি-স্ক্যান।

মূলধারার উন্নয়ন পরিকল্পনায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তি ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অঞ্চলভিত্তিক শুমারি শীর্ষক প্রেস ব্রিফিং - এ অতিথি বৃন্দ -অপরাজেয়

অঞ্চলভিত্তিক শুমারির মাধ্যমে মূলধারার উন্নয়ন পরিকল্পনায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করার দাবি

মূলধারার উন্নয়ন পরিকল্পনায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করতে অঞ্চলভিত্তিক শুমারির বিকল্প নেই, বলে মন্তব্য করেছে প্রতিবন্ধী অধিকার বিষয়ে দীর্ঘদিন কাজ করা বিশেষজ্ঞরা। গত ২৯ আগস্ট জাতীয় প্রেসক্লাবে একশনএইড বাংলাদেশ ও ইয়াং পাওয়ার ইন সোশ্যাল একশন (ইপসা) আয়োজিত "মূলধারার উন্নয়ন পরিকল্পনায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তি ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অঞ্চলভিত্তিক শুমারি" শীর্ষক এক প্রেস ব্রিফিং এ সরকারকে দ্রুত দেশের প্রতিবন্ধী মানুষের সংখ্যা এবং প্রতিবন্ধিতার ধরণ ও মাত্রা নির্ধারণ করে তাদের উন্নয়ন পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করতে পরামর্শ দেন। এছাড়া, বক্তারা আগামী নির্বাচনে সব রাজনৈতিক দলের ইশতেহারে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনার পরামর্শ দেন।

জাতীয় নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক সঠিক পরিসংখ্যানের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে একশনএইড বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর ফারাহ্ কবীর জানান, একশন এইড বাংলাদেশ ও ইয়াং পাওয়ার ইন সোশ্যাল একশন (ইপসা) এর যৌথ উদ্যোগে চাঁদপুরের শাহরাস্তি উপজেলায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ওপরে একটি শুমারি পরিচালনা হয়েছে। এই শুমারিতে পাওয়া ৪৭৪০ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির যাবতীয় তথ্য অনলাইন ডাটাবেইজে সংরক্ষন করা হয়েছে। ফলে এর মধ্য দিয়ে বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কর্মকাণ্ডে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে এবং প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে সরকারী অথবা অন্যান্য সংগঠনের জন্য সহায়ক হবে। তিনি আগামী নির্বাচনে সব রাজনৈতিক দলের ইশতেহারে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে সব রাজনৈতিক দলকে আহ্বান জানান। রাজনৈতিকভাবে অঙ্গীকার করে আসার পরও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও সুরক্ষায় সরকারের উদাসীন মনোভাবের জন্য হতাশা ব্যক্ত করেন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ বিষয়ক জাতিসংঘ কমিটির সাবেক সদস্য বিশেষজ্ঞ মনসুর আহমেদ চৌধুরী। তিনি বলেন, আমি একজন সক্রিয় প্রতিবন্ধী নাগরিক হওয়ার পরও ২০০১ এবং ২০১১ সালের আদমশুমারিতে আমাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। তিনি আশা করেন বর্তমানে যে প্রতিবন্ধী শনাক্তকরণ জরিপ চলছে তা যেন সঠিক তথ্য নির্ভর হয়, তা গণমাধ্যম নিশ্চিত করবে।

বর্তমানে চাঁদপুর ৫ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য ও চেয়ারম্যান, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সংসদীয় স্ট্যান্ডিং কমিটি মেজর (অব.) রফিকুল আলম, বীর উত্তম, এমপি, সরকারের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন রাখেন, বাজেটে এমন কোন ব্যবস্থা কি রাখা যায় যাতে করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের এমন মানবেতর জীবন যাপন করতে না হয় আর? তাছাড়া সরকারের কাজের আগেই জরিপ সম্পন্ন হওয়াতে তিনি একশনএইড বাংলাদেশ ও ইপসাকে ধন্যবাদ জানান। আগামী নির্বাচনী ইশতেহারে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও সুরক্ষার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে কাজ করার প্রতিশ্রুতিও দেন তিনি। প্রেস ব্রিফিং এ আরো বক্তব্য রাখেন, একশনএইড বাংলাদেশের প্রোগ্রাম, পলিসি এন্ড ক্যাম্পেইনের ডিরেক্টর আসগর আলী সাবরি এবং ইপসা'র প্রধান নির্বাহী মোঃ আরিফুর রহমান ও ওয়েবপোর্টাল উপস্থাপন করেন প্রোগ্রাম ম্যানেজার ভাস্কর ভট্টাচার্য।

একশনএইড বাংলাদেশ ও ইয়াং পাওয়ার ইন সোশ্যাল একশন (ইপসা) এর যৌথ প্রয়াসে সম্প্রতি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের একটি অঞ্চলভিত্তিক শুমারি কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। এর মাধ্যমে চাঁদপুর জেলার শাহরাস্তি উপজেলার অন্তর্ভুক্ত ১০টি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভার প্রতিটি গৃহস্থলীতে ৪৭৪০ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে শনাক্ত করা হয়েছে। এছাড়া, এই শুমারিতে উপজেলাটির প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আর্থ সামাজিক তথ্য তুলে ধরার পাশাপাশি প্রাপ্ত তথ্যের সহজলভ্যতার জন্য ছবি সংবলিত একটি অনলাইন ডাটাবেইজ তৈরী করা হয়েছে। ফলে এর মাধ্যমে যে কোন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য সহজে পাওয়া যাবে।

পুঠিয়ায় প্রতিবন্ধী কারিগরি কলেজের সাফল্য

অপরাজেয় ডেস্ক

২০১৩ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের ফলাফলে রাজশাহীর পুঠিয়ায় অবস্থিত দেশের একমাত্র প্রতিবন্ধী শিশু নিকেতন সমন্বিত বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজ উপজেলায় প্রথম স্থান অর্জন করেছে। উপজেলা শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে, উপজেলায় কলেজগুলোর মধ্যে প্রতিবন্ধী শিশু নিকেতন সমন্বিত বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজ পাসের হার ৯৬ দশমিক ৪৩ শতাংশ পেয়ে প্রথম, পুঠিয়া কারিগরি কলেজ পাসের হার ৮৮ দশমিক ১৩ শতাংশ পেয়ে দ্বিতীয় এবং ভড়ুয়াপাড়া টেকনিক্যাল এন্ড বিএম কলেজের ৮৭ দশমিক ৫ শতাংশ পেয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছে। এ ব্যাপারে প্রতিবন্ধী শিশু নিকেতন সমন্বিত বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজের অধ্যক্ষ দিলীপ কুমার শীল জানান, এবার আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতিবন্ধী, এতিম, দরিদ্রসহ মোট ৫৬ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে।

এদের মধ্যে ৫৪ জন পাস করে। ২ জন জিপিএ- ৫, ৫০ জন এ গ্রেড, ২ জন এ-মাইনাস পেয়ে কৃতকার্য হয়েছে। আমাদের কলেজটি দেশের প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের একমাত্র কলেজ হওয়ার পরেও এমপিওভুক্ত না হয়েও এ সাফল্য অর্জন করেছে। ভবিষ্যতে আরও ভাল করার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন তিনি। তবে তিনি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসনের জন্য কলেজটি বিশেষভাবে এমপিওভুক্ত করণের জন্য প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে বিনীতভাবে অনুরোধ জানিয়েছেন।

বাংলাব্রেইল : প্রজেক্ট

৮ম পৃষ্ঠার পর

অডিও রেকর্ড করা হয়েছে। সম্পূর্ণ রেকর্ড হওয়া অডিওবইগুলো এই মূহুর্তে ডাউনলোড করা যাবে বাংলাব্রেইলের ওয়েবসাইট থেকে। পরবর্তীতে অডিওবইগুলো এমপিথ্রি পে-য়ারে করে বাংলাদেশের নানা জায়গায় দৃষ্টিহীন শিশুদের মাঝে বিতরণ করার পরিকল্পনা আছে। এছাড়া এই অডিওবুকগুলো যেকোন শিক্ষার্থীই সহায়ক পাঠ উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন।

ওয়েবসাইট ঠিকানা
http://www.banglabraille.org
ফেসবুক গ্রুপ
https://www.facebook.com/groups/banglabraille/

প্রতিবন্ধী : শিক্ষার্থী

৮ম পৃষ্ঠার পর

যাওয়া একেবারেই সম্ভব হয় না। বর্ষার সময় বিদ্যালয়ের সামনের জায়গাটুকু পানিতে ডুবে থাকার ফলে প্রতিবন্ধী ছাত্রছাত্রীদের চলাফেরা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ন হয়ে পড়ে। এ ছাড়া বিদ্যালয়ের চার পাশ দখলদারিদের আওতায় বড় বড় কলকারখানা গড়ে ওঠেছে যার তীব্র শব্দে অপ্রতিবন্ধী ছাত্রছাত্রীদেরই পড়াশোনার ব্যাঘাত ঘটে সেখানে যদি থাকে মৃদু শ্রবণ প্রতিবন্ধী তাদের অবস্থা কী পরিমাণ শোচনীয় তা আর বলার অপেক্ষা রাখেনা। এ বিষয়ে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করা হলে তারা বলেন তাদের সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সরকারী অনুদান এবং পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে তারা কিছুই করতে পারছেন না। বর্তমানে বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় সামান্য কিছু কাজ চলছে, যেখানে তারা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিষয়টি মাথায় রাখবেন বলে এ প্রতিবেদককে জানিয়েছেন। তবে এ বিষয়ে সরকার সংশি-ষ্টদের বিশেষ নজর দেয়া অত্যন্ত জরুরী বলে মনে করছেন অভিভাবকগণ। অন্যথায় এই সম্ভাবনাময় এই ছেলেমেয়েগুলো ধীরে ধীরে পিছিয়ে পড়তে বাধ্য হবে।

প্রসঙ্গ : মনোসামাজিক প্রতিবন্ধিতা এবং জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য দিবস

মোস্তাফা কামাল যাত্রা

প্রতিবছর ১০ অক্টোবর, বিশ্বব্যাপি পালিত হয় মানসিক স্বাস্থ্য দিবস। ১৯৯২ সাল থেকে মানসিক স্বাস্থ্য ইস্যুতে জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং মানসিক স্বাস্থ্য সেবাকর্মী গড়ে তোলা ও মানসিক স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের গুরুত্ব-প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জাতীয়-আন্তর্জাতিক নীতমালা প্রণয়নের প্রত্যয়ে বিশ্বব্যাপি একযোগে নানান আয়োজনের মধ্য দিয়ে এ দিবসটি পালিত হয়।

বাংলাদেশে সরকারী পর্যায়ে 'বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস' পালিত না হলেও বেসরকারীভাবে বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান ঘটা করে দিবসটি উদযাপন করে থাকে। চট্টগ্রামে স্বেচ্ছাসেবী উন্নয়ন সংস্থা উৎস এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নেতৃত্বে গঠিত জনসংগঠনের আঞ্চলিক মোর্চা 'এলায়েন্স অব আরবান ডিপিও'স ইন চিটাগাং (এইউডিসি)' বিগত এক দশক ধরে এ দিবস পালনের পাশাপাশি ২৩ জুলাইকে 'জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য দিবস' হিসেবে ঘোষণার জন্য অধি-পরামর্শমূলক কর্মসূচির আয়োজন করে আসছে।

২০০৬ সালে জাতিসংঘে গৃহিত 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার ও সুরক্ষা বিষয়ক আন্তর্জাতিক সনদ'-এ মানসিক স্বাস্থ্যহানির কারণে সৃষ্ট জটিল মানসিক সমস্যা বা রোগকে মনোসামাজিক প্রতিবন্ধিতা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। এ সনদের স্বাক্ষর ও অনুস্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশেও ভুক্তভোগী জনগোষ্ঠী, তাদের পরিবার ও এই ইস্যুতে কর্মরত প্রতিষ্ঠানগুলো মনোসামাজিক প্রতিবন্ধিতা প্রতিরোধে এবং মানসিক স্বাস্থ্য বিপর্যয় রোধে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে একটি 'জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য দিবস' ঘোষণার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে থাকে।

মূলত বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশেই 'বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস'-এর পাশাপাশি 'জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য দিবস' পালিত হয়ে থাকে। স্ব-স্ব দেশের মানসিক স্বাস্থ্য ইস্যুটিকে গুরুত্বসহকারে তুলে আনার স্বার্থে আমাদের দেশেও ২৩ জুলাইতে দিবসটি পালনের উদ্যোগ নেওয়া জরুরি। পাশাপাশি কারণ হিসেবে যে বিবেচনাটি মুখ্য হয়ে উঠেছে তা হলো- এদিন মানসিক স্বাস্থ্য অধিকার নিয়ে আমৃত্যু কর্মরত মনোসামাজিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি মহসিন সিদ্দিক লুলুর মৃত্যু দিবস। ২৩ জুলাই, ২০০৭ সালে কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে মৃত্যুবরণ করেন তিনি। জীবদ্দশায় তিনি মানসিক সমস্যাগ্রস্থ ব্যক্তি ও তাদের পরিবারের সদস্যদের সংগঠিত করে মানসিক স্বাস্থ্য অধিকার আদায়ে নানান ধরনের কর্মকা- পরিচালনা করেছিলেন। যার মধ্যে উলে-খযোগ্য- ১৯৭৬ সাল থেকে মানসিক সমস্যাক্রান্ত ব্যক্তিদের অংশগ্রহণে প্রতিবছর একটি সমাবেশের আয়োজন করা। এ সমাবেশ থেকে মানসিক সমস্যাগ্রস্থ ব্যক্তিদের অধিকার সুরক্ষায় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য একটি দাবিনামা উপস্থাপিত হতো। মহসিন সিদ্দিক লুলুর নেতৃত্বে আয়োজিত এ সমাবেশ পরবর্তী সময়ে (২০০৪ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত) আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা 'অ্যাকশন অন ডিজএ্যাবিলিটি এন্ড ডেভেলাপমেন্ট (এডিডি)'-এর সার্বিক সহযোগিতায় 'মানসিক সমস্যাগ্রস্থ ব্যক্তিদের কেন্দ্রীয় সম্মেলন' হিসাবে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু তার অপ্রত্যাশিত মৃত্যু পরবর্তী আলোচ্য সম্মেলন আয়োজনে এক ধরণের স্থবিরতা তৈরি করে। মানসিক স্বাস্থ্য ইস্যুতে তাঁর ভূমিকার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শনের প্রত্যয়ে জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরাম ২০০৮ সালে প্রতিবছর ২৩ জুলাই মহসিন সিদ্দিক লুলুর প্রয়ান দিবসকে 'জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য দিবস' ঘোষণার দাবির প্রেক্ষিতে যৌক্তিকতা তুলে ধরে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে লিখিত আবেদন করেছিল। কিন্তু দুঃখজনক সত্য হলো- আজও এ দিবসটি স্বীকৃতি পায়নি।

একটু গভীরে তাকালে আমরা দেখতে পাবো, আমাদের দেশ একটি দুর্যোগপূর্ণ দেশ। নানান ধরনের মানবসৃষ্ট দুর্যোগের কারণেও মানুষ মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন। প্রাত্যহিক জীবনের নানান অসঙ্গতি, নিরাপত্তাহীনতা আর আর্থিক অনিশ্চয়তা মানুষের উপর যে চাপ সৃষ্টি করে, তা তাদের মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলতে বাধ্য করে। ফলে মানুষ মানসিক স্বাস্থ্য বিপর্যয়ের শিকার হয়ে, স্বতঃস্ফূর্ততা হারিয়ে, কর্মক্ষমতা হারিয়ে, আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মানসিক রোগীতে পরিণত হয়; যে অবস্থায় পর্যবশিত হয়ে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত একজন মানুষ সুস্থ ও গ্রহণযোগ্য সামাজিকতা রক্ষায় ব্যর্থ হন। ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের এ মনোবিপর্যয়ের কারণে তার পরিবারও সমাজের বিভিন্ন স্তরে নানান ধরনের প্রতিবন্ধকতার মুখে পড়ে।

মূলত, মনোসামাজিক প্রতিবন্ধিতা প্রতিরোধে মানসিক স্বাস্থ্য ইস্যুতে ব্যাপক সচেতনতা তৈরি এবং মনোসামাজিক স্বাস্থ্যসেবায় প্রযোজ্য ঔষধ ও চিকিৎসাকর্মী, সেবা ও সেবার মান উন্নয়ন এবং মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক একটি জাতীয় নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্র প্রস্তুতেও এ দিবসটির প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। এ দিবসকে কেন্দ্র করে প্রতিবছর প্রসঙ্গটি নানান স্তরে আলোচিত হবে, প্রযোজ্য ইতিবাচক নীতিগত সিদ্ধান্ত, পরিকল্পনা ও পদক্ষেপগুলো গ্রহণে মতামত তৈরি হবে। আর দিবসটি যদি হয় মহসিন সিদ্দিক লুলুর মতো একজন একনিষ্ঠ আত্মত্যাগী মানসিক স্বাস্থ্য অধিকার আদায়ের লড়াকু সৈনিকের মৃত্যু দিবস কেন্দ্রিক, তবে তা হবে যথার্থ। যার মধ্য দিয়ে আমরা তাঁর অনবদ্য অবদানের প্রতিও সম্মান জানাতে পারব, দিতে পারব তাঁর কৃতকর্মের স্বীকৃতি।

এ প্রসঙ্গে সংশিস্নষ্ট সকলের ইতিবাচক ভূমিকা ও কার্যকরী পদক্ষেপ আশা করছি, যার মধ্য দিয়ে মনোসামাজিক প্রতিবন্ধিতা প্রতিরোধের স্বপক্ষে অগ্রণী উদ্যোগ গ্রহণেরও অনবদ্য সুযোগ সৃষ্টি হবে।

মোস্তাফা কামাল যাত্রা
নির্বাহী পরিচালক
উৎস, চট্টগ্রাম

Best Compliments From
HAMID ENTERPRISE
71/A FAKIRAPOOL (2nd FLOOR), DHAKA-1000, BANGLADESH
E-mail: hamidebd@yahoo.com, shaheen75@gmail.com
Hot Line : 0191 626 8295
1 Stop Services- For Garments Accessories

আপনি কি ঘরে বসে অপরাজেয় পেতে চান?
বাৎসরিক গ্রাহক হোন :
অপরাজেয়- এর গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলীঃ
বাৎসরিক ফি : ১০০ টাকা
টাকা পাঠাবার মাধ্যমঃ bKash
বিকাশ নাম্বারঃ ০১৬৭০৮১২৭৯৮
বিকাশ করার পর আপনার বিকাশ আইডি নাম্বার, মোবাইল নাম্বার ও পূর্ণ ঠিকানা লিখে SMS করুন ০১৬৭০৮১২৭৯৮ নাম্বারে।
এরপর ফিরতি SMS এ আপনার গ্রাহক সাবস্ক্রিপশন নিশ্চিত করা হবে এবং পেয়ে যাবেন বছরের প্রতিটি সংখ্যা আপানার ঠিকানায়।

ঘরে বসেই কিনুন অপরাজেয় পত্রিকা
রকমারি.com
অনলাইনে অথবা ফোনে অর্ডার করুন
http://www.rokomari.com/publisher/1368 অথবা ০১৬ ১৯৬২ ১৬৭৯ - ৬

প্রতিবন্ধী মানুষেরাও নির্বাচনে দাঁড়াতে পারবেন

আমিরুল ইসলাম

সর্বোচ্চ তিন বছরের কারাদণ্ড ও পাঁচ লাখ টাকা জরিমানার বিধান রেখে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন সংশোধন করছে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়। নতুন আইনে প্রতিবন্ধীদের নাম ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত, ভোট প্রদান এবং নির্বাচনে অংশ নেয়া অর্থাৎ প্রার্থী হওয়ার সুযোগ রাখা হচ্ছে। জাতীয় সংসদের আগামী অধিবেশনে অনুমোদনের জন্য তা উপস্থাপন করা হবে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন পাসের সঙ্গে সঙ্গে এর আগে তৈরি করা বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন বাতিল বলে গণ্য হবে। খবর সংশি-ষ্ট সূত্রের। এ বিষয়ে সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী প্রমোদ মানকিন বলেন, জাতিসংঘ প্রতিবন্ধী অধিকার ও সুরক্ষা সনদে স্বাক্ষর করায় পুরনো আইন সংশোধন করা জরুরি হয়ে পড়েছে। তাছাড়া আইন সময়ের প্রয়োজনে এবং জনকল্যাণে তৈরি ও সংশোধন করা হয়। এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম কিছু হচ্ছে না। আন্তর্জাতিক সনদ বজায়ে রাষ্ট্রসংঘের নিয়মনীতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার আইনটিকে আপডেট করা হয়েছে মাত্র। এতে দেশের প্রতিবন্ধী নাগরিকদের অধিকার সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা পাবে। অধিকার ও মর্যাদার সুরক্ষা, শারীরিক-মানসিক উন্নয়ন, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং দেশ ও জাতির কল্যাণে তাদের অবদান রাখার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন-২০১৩ প্রণয়ন করা হচ্ছে। গত বছর জাতিসংঘ কনভেনশন অন দ্য রাইটস অব পারসনস উইথ ডিজেবিলিটিস-এ স্বাক্ষর করায় নতুন করে আইনটি প্রণয়ন করতে হয়েছে বলে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়। সূত্র জানায়, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য গণপরিবহনে শতকরা ৫ ভাগ আসন সংরক্ষিত থাকবে। যেসব গণপরিবহন এ আইন অমান্য করবে সে গণপরিবহনের লাইসেন্স বাতিলের সুপারিশ করা হবে। গণপরিবহন বলতে জল, স্থল ও আকাশপথে পরিচালিত যানবাহনকে বোঝানো হয়েছে। প্রতিবন্ধীরা ভবন, যানবাহন, রাস্তাঘাট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, রেলস্টেশন, বাস টার্মিনাল, লঞ্চ টার্মিনাল, বিমান ও সমুদ্রবন্দর, স্থলবন্দর, দুর্যোগকালীন আশ্রয় কেন্দ্র, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বিনোদন ও খেলাধুলার স্থান, দর্শনীয় স্থান, পার্ক, গ্রন্থাগার, গণশৌচাগার, আন্ডারপাস ও ফুট ওভারব্রিজের ওপর দিয়ে বাধাহীনভাবে নিয়মিত যাতায়াত করার অধিকার রাখে। কোনো অবস্থায় তাদের এ অধিকারক্ষুণ্ণ করা

বাংলাদেশের একমাত্র প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক পত্রিকা
অপরাজেয়
পরিবর্তনের চেতনায়
বর্ষ ১, সংখ্যা ৪, সেপ্টেম্বর ২০১৩

উপেক্ষিত সর্বজনীন প্রবেশগম্যতা তথা ইমারত নির্মাণ বিধিমালা

মুহাম্মদ মহিদুল ইসলাম

বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড (ইমারত বিধি) আইনে থাকলেও নেই তার কার্যকারিতা। কোন প্রতিষ্ঠান, ভবন মালিক বা সংশি-ষ্ট কর্তৃপক্ষ কেউই মানছেন না। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সর্বক্ষেত্রে (সর্বজনীন) প্রবেশগম্যতা উপেক্ষিত।

১৯৯৩ সালে হাউজ বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউশনের মাধ্যমে বিভিন্ন পর্যায়ের বিশেষজ্ঞের মতামতের ভিত্তিতে প্রণীত হয় বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড (বিএনবিসি)। এছাড়া Building Construction Act-1952 (Act no. 11 of 1953) এর section 18 এর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার ঢাকা মহানগর ইমারত (নির্মাণ, সংরক্ষন ও অপসারন) বিধিমালা ২০০৮ আইন প্রণয়ন করেন। কিন্তু সেই আইন যথাযথ কার্যকর না হওয়ায় প্রতিনিয়ত বিল্ডিং কোড অগ্রাহ্য হলেও কেউ শাস্তি পাচ্ছে না। সর্বজনীন প্রবেশগম্যতা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও চাহিদা। তাদের সহায়ক চলাচলের ব্যবস্থা না থাকার দরুন বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারা অসুবিধার সম্মুখিন হচ্ছেন।

বাংলাদেশ গেজেটের ৭ম অধ্যায়ের ৬৪ নং ধারায় উলে-খ আছে যে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিসহ সর্বজনীন গম্যতার ও গৃহীত বিশেষ ব্যবস্থা নিম্নরূপ হবে। যথা-

ক) সকল ইমারতে পার্কিং স্পেস হতে সংলগ্ন তলায় লিফট (যদি থাকে) পর্যন্ত সর্বজনীন গম্যতার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

খ) ১০০ বর্গ মিটারের উপর ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট সকল ব্যবহার উপযোগী ইমারত সমূহে (যেমন- হোটেল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অফিস, স্বাস্থ্য সেবা, সমাবেশ ও বানিজ্যিক ব্যবহার) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিসহ সর্বজনীন গম্যতা অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে।

গ) প্রযোজ্য সকল ইমারতের প্রতিতলায় নূন্যতম একটি টয়লেট অথবা সার্বিক টয়লেট সংখ্যায় ৫% (যাহা অধিক) পরিমাণ টয়লেটে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিসহ সর্বজনীন গম্যতার জন্য সহজেই প্রবেশগম্যতার যোগ্য এবং সুনির্দিষ্ট ভাবে দিক নির্দেশিত করতে হবে।

ঘ) প্রযোজ্য প্রতিটি ইমারতে নূন্যতম একটি পার্কিং অথবা সর্বমোট প্রয়োজনীয় সংখ্যার ৫% (যাহা অধিক) পরিমাণ পার্কিং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিসহ সর্বজনীন গম্যতার জন্য নির্দিষ্ট করতে হবে।

এবং পরিশিষ্ট - ২ এ কক্ষ, করিডোর, চলাচলের পথ, হুইলচেয়ার ঘুরাবার জন্য জায়গা, দরজার সাইজ, রেইলিং, র‌্যাম্প, সিঁড়ি, লিফট, পার্কিং, সিটিং কি রূপ হবে তা স্পষ্ট ভাবে উলে-খ করা হয়েছে।

এছাড়া গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ৭ ডিসেম্বর ২০০৯ সালে "প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ব্যবহার উপযোগী র‌্যাম্প ও টয়লেট নির্মাণ প্রসঙ্গে" একটি আদেশ জারি করে সংশি-ষ্ট সকলের কাছে চিঠি প্রেরণ করে ছিলেন। তা সত্বেও এই বিধিমালা লঙ্ঘন হচ্ছে প্রতিনিয়ত। সর্বজনীন প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত না হওয়াতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা বিশেষ করে হুইলচেয়ার ব্যবহারকারী ব্যক্তিরা শিক্ষা, চিকিৎসা, যাতায়াত ব্যবস্থা ইত্যাদি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ফলে মানুষের মৌলিক চাহিদা থেকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা সমঅধিকার বঞ্চিত রয়ে যাচ্ছে। মোট জনসংখ্যার ১৫ ভাগ অর্থাৎ প্রায় ২.৫ কোটি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি (বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার পরিসংখ্যান মতে) অবহেলিত জীবন যাপন করছেন।

নগর পরিকল্পনাবিদদের মতে, অবিলম্বে বিল্ডিং কোড প্রয়োগ ও ভবন নির্মাণ কর্মকান্ড তদারকের জন্য একটি নিয়ন্ত্রণ বা নীতি নির্ধারণী কমিটি প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। এই কমিটি স্থান ও এখতিয়ার ভেদে মাঠ পর্যায়ে বিল্ডিং কোড বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন নির্বাহী সংস্থাকে দায়িত্ব দিতে পারেন। পাশাপাশি সব পর্যায়ে প্রকৌশলীদের বিল্ডিং কারিগরি বিষয়ে যথাযথ প্রশিক্ষণ নেয়ার ব্যবস্থা নিতে হবে। আর আইন অমান্যকারীদের কঠোর শাস্তির বিধানে আনার জন্য কঠোর আইন প্রণয়নের পাশাপাশি তা বাস্তবায়নে যথাযথ মনিটরিং প্রয়োজন। তবে বেশ কিছু সরকারী ও কিছু বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, ভবনে বর্তমানে সর্বজনীন প্রবেশগম্যতার বিষয়টি পরিলক্ষিত হচ্ছে। যা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মনে আশার সঞ্চার করছে।

সকল ধরনের সরকারী, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, ভবন, পার্ক, ফুটপাতে সর্বজনীন প্রবেশগম্যতা বাস্তবায়ন করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কঠিন যাত্রাকে সহজ ও আরামদায়ক করা গেলে দেশের উন্নয়নে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা সম্ভব।

কারণ মোট জনসংখ্যার ১৫ ভাগ মানুষকে দূরে সরিয়ে রেখে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন কোনভাবেই সম্ভব নয়।

স্বনির্ভরতা : ভিটিসিবি'র অঙ্গীকার

অপরাজেয় ডেস্ক

দু'হাত পেতে নয়, স্বনির্ভর হয়ে বেঁচে থাকার স্বপ্ন ছিল বরিশালের বাকেরগঞ্জ থানার কৃষ্ণনগরের বাসিন্দা দৃষ্টি প্রতিবন্ধী জাহানারা বেগমের দু'চোখে। মাত্র পাঁচ বছর বয়সে তিনি টাইফয়েডে আক্রান্ত হয়ে ধীরে ধীরে দৃষ্টিশক্তি হারাতে শুরু করেন। জীবনের এই অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন সত্বেও মনোবল হারান নি তিনি। গ্রাম্য চিকিৎসকের পরামর্শে ভালো ফল না পেয়ে শহরের ডাক্তার দেখাতে আসেন। কিন্তু ততদিনে আঁধার ঘনীভূত তার চারপাশে। দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের স্কুল থেকে এসএসসি পাস করে ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার ফর দি ব-াইন্ড (ভিটিসিবি) থেকে 'চক পেন্সিল মেকিং'-এর ওপর প্রশিক্ষণ নেন। এখন ঝলমলে রোদ্দুরের আভায় অদম্য মনোবল নিয়ে এগিয়ে চলেছেন দৃপ্ত পদক্ষেপে।

জাহানারার মতো আরো অনেকের আলোর দিশারী হতে ১৯৭৭ সালে যাত্রা শুরু ভিটিসিবির। প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের এক বছর মেয়াদে প্যাকেজিং, বুকবাইন্ডিং, কম্পিউটার অপারেটিং কোর্স ফর দি ব-াইন্ড, টেলিফোন পিএবিএক্স অপারেশন, ক্যান্ডেল মেকিং, টেইলারিং, ফিজিওথেরাপি ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এখানে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ও শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার দেয়া হয়। নূন্যতম আঠারো বছর বয়সী হতে হবে প্রশিক্ষণার্থীকে।

> প্যাকেজিং, বুকবাইন্ডিং, কম্পিউটার ব-াইন্ড অপারেটিং কোর্স ফর দি ব-াইন্ড, টেলিফোন পিএবিএক্স অপারেশন, ক্যান্ডেল মেকিং, টেইলারিং, ফিজিওথেরাপি ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়

মানসিক প্রতিবন্ধীদের জন্য রয়েছে বিশেষ ব্যবস্থা। এক বছর মেয়াদি এ কোর্সে প্রশিক্ষণার্থী মাসে দুই হাজার টাকা সম্মানী এবং প্রশিক্ষণ শেষে পুনর্বাসন ব্যবস্থাসহ পাঁচ হাজার টাকা ও সার্টিফিকেট পান।

প্রশিক্ষণ পরবর্তী সরকারি-বেসরকারি ব্যাংক, প্যাকেজিং, বুকবাইন্ডিং, মোমের কারখানা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানসহ ফোন ও কম্পিউটার অপারেটর পদের কাজেরও ব্যবস্থা করে ভিটিসিবি এবং সে সব প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীরা ভালো বেতনও পান। এছাড়াও প্রশিক্ষণার্থীরা ইচ্ছে করলে পাঁচ হাজার টাকা পুঁজি নিয়ে নিজ উদ্যোগে গড়ে তুলতে পারেন ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান।

যোগাযোগের ঠিকানাঃ
ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার ফর ব-াইন্ড
(ভিটিসিবি)
৪, মেইন রোড, সেকশন-১
মিরপুর, ঢাকা-১২১৬।
ফোনঃ ০১৭১২৮৬২২৯২

অনন্য উদ্যোগ

বাংলাব্রেইল | BanglaBraille

বাংলাব্রেইল প্রজেক্ট

অপরাজেয় ডেস্ক

বছরের অর্ধেক পেরিয়ে গেলেও দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা পায়নি ২০১৩ সালের পাঠ্যপুস্তক। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এবার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে নতুন ১০৪টি বই প্রণয়ন করায় সঙ্কট নতুন রূপ পেয়েছে। তাই বলে সব কিছুর দায় রাষ্ট্রের উপর চাপিয়ে হাল ছেড়ে বসে থাকা তো যায় না! বিড়ম্বনার শিকার এইসব দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের হাতে ব্রেইল পদ্ধতির পাঠ্যপুস্তক পৌঁছানোর তাগিদ থেকে সুদূর প্রবাসে বসেই উদ্যোগ নিলেন কম্পিউটার বিজ্ঞানী রাগিব হাসান। যিনি বর্তমানে ইউনিভার্সিটি অফ আলাবামা অ্যাট বার্মিংহামের কম্পিউটার বিজ্ঞান বিভাগে সহকারী অধ্যাপক পদে কর্মরত আছেন।

প্রথমেই দেশে অধ্যাপক মুহম্মদ জাফর ইকবাল স্যারের সাথে যোগাযোগ করেন। স্যার সানন্দে রাজি হয়ে যান তার নিজস্ব প্রিন্টারে সমস্ত ব্রেইল বইগুলো সম্পূর্ণ বিনামূল্যে প্রিন্ট করে দিতে। স্যারের সম্মতি পেয়ে সেদিনই ফেসবুকে বাংলাব্রেইল নামে একটি গ্রুপ তৈরি করেন। প্রথম দিনেই যোগ দেন চারশর বেশি মানুষ। ফেসবুকের মাধ্যমে আগ্রহী স্বেচ্ছাসেবীদের সংগঠিত করে গত ১ মাস ধরে বাংলাদেশের স্কুল পর্যায়ের পাঠ্যবইগুলোকে টাইপ করে ব্রেইলে ছাপার জন্য উপযোগী ইউনিকোড সংস্করণে রূপান্তর করেছেন। আর এর পাশাপাশি কাজ চলছে পাঠ্যবইগুলোর অডিও সংস্করণ, যেখানে বাংলাব্রেইলের স্বেচ্ছাসেবী কর্মীরা সম্পূর্ণ পাঠ্যবই পড়ে অডিও রেকর্ড তৈরী করে দিচ্ছেন। দৃষ্টিহীন শিক্ষার্থীরা এসব অডিও বই মোবাইল ফোন বা অন্যান্য মাধ্যমে বাজিয়ে শুনতে পারবে। দৃষ্টিহীন শিশুদের কাছে পাঠ্যবই পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে জুন মাসের শেষে শুরু হয় বাংলাব্রেইল প্রজেক্ট। অনন্য এই উদ্যোগটি ফেসবুক ব্যবহারকারীদের মাঝে বেশ সাড়া জাগিয়েছে। জুলাই মাসের ২৮ তারিখের হিসাবে বাংলাব্রেইলের এই উদ্যোগে যোগ দিয়েছেন প্রায় ২৬০০ জন কর্মী।

এ পর্যন্ত বাংলাব্রেইলের কর্মীরা ১৭টি অডিওবুক এবং ২২টি ইউনিকোডকৃত টেক্সটবুক তৈরি করে দিয়েছেন। অডিওবুক প্রজেক্টের অধীনে এ মুহূর্তে প্রায় ৫৭জন স্বেচ্ছাসেবক বই তৈরীর কাজ করেছেন। এই কাজে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে যোগ দিয়েছেন অভিনেত্রী সুতপ্পুনাহার লতা এবং বিটিভির মাটি ও মানুষ অনুষ্ঠানের উপস্থাপক রেজাউল করিম সিদ্দিক। এ অবধি প্রায় ৯০ ঘন্টার এরপর ৭ম পৃষ্ঠায়

নারায়ণগঞ্জ শাসনগাঁও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের দুর্দশা

খলিলুর রহমান

পাশ্চাত্যের ডান্ডি নামে খ্যাত বন্দর নগরী নারায়ণগঞ্জের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং বিসিক শিল্পনগরী শাসনগাঁও এলাকা। এখানে প্রায় লক্ষাধিক মানুষের বাস। অত্যন্ত নিম্ন আয়ের এই মানুষগুলোর ছেলে মেয়েরা অভিজাত স্কুলে লেখাপড়ার সুযোগ পায় না। সরকারী স্কুলই ভরসা। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য এত মানুষের জন্য রয়েছে মাত্র একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

৬৬নং শাসনগাঁও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয় ১৯৬৮ সালে যেখানে প্রায় ১০০০ ছাত্র ছাত্রীর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধী ছাত্র ছাত্রী রয়েছে ২০ জনেরও বেশি। স্বাধীনতার পূর্বে স্থাপিত হলেও এত বছরেও উন্নয়নের ছোঁয়া লাগেনি এই স্কুলে। হুইলচেয়ার সহায়ক র‌্যাম্প অথবা ব্রেইল বই যাদের জীবনকে বদলে দিতে পারে তেমন ব্যবস্থা এ বিদ্যালয়ে নেই। অথচ তাদের জীবন মান উন্নয়নের জন্য একটু বিশেষ যত্নের প্রয়োজন। শিক্ষার সহায়ক পরিবেশ তো নেইই উপরন্তু আছে নিরাপত্তা নামক দুটি গেট যা অত্যন্ত উঁচু এবং প্রায় ৬/৭ টি সিঁড়ি ডিঙ্গিয়ে প্রতিবন্ধী ছাত্রছাত্রীদের নির্বিঘ্নে প্রবেশে বিঘ্ন ঘটায়। একটি পাকা ও দুটি আধাপাকা ভবন আছে যার একটিতেও নেই প্রতিবন্ধী ছাত্রছাত্রীদের সহজ প্রবেশগম্যতা। প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের বসার মত কোন আলাদা ব্যবস্থা নেই। নেই প্রশিক্ষিত শিক্ষক। টয়লেটের অবস্থা এতই খারাপ যে, সেখানে প্রতিবন্ধী ছাত্রছাত্রীদের এরপর ৭ম পৃষ্ঠায়

পোর্টেবল র‌্যাম্প

মাত্র দুই-তিন ধাপ সিঁড়ি অপ্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্যে বাধা নয় কিন্তু একজন শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য এটি হতে পারে পাহাড়সম বাধার কারণ। স্থায়ী র‌্যাম্প তৈরিতে অনেকেই উৎসাহী নন তাই বাংলাদেশে এই প্রথম হুইলচেয়ার সহায়ক কাঠের পোর্টেবল র‌্যাম্প তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে বি-স্ক্যান। সর্বোচ্চ দেড় ফিট উচ্চতায় এটি ব্যবহার করা যাবে। এটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো ব্যবহার শেষে ভাজ করে একে সরিয়ে রাখা যাবে।

পোর্টেবল র‌্যাম্পটি ক্রয় করতে আগ্রহী হলে আজই যোগাযোগ করুন : ০১৬৭৬৮২৮৭৪

বাংলাদেশের একমাত্র প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক পত্রিকা
অপরাজেয়
পরিবর্তনের চেতনায়
মুহাম্মদ মহিদুল ইসলাম সম্পাদিত
বাংলাদেশী সিস্টেমস চেঞ্জ এ্যাডভোকেসি নেটওয়ার্ক (বি-স্ক্যান) কর্তৃক প্রকাশিত, হামিদ এন্টারপ্রাইজ ঢাকা হতে মুদ্রিত।
অফিস : ৭১/১, ফকিরাপুল (২য় তলা), মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।
ই-মেইল : oporajeyo@b-scan.org, ওয়েব সাইট : www.b-scan.org, মোবাইল: ০১৬৭০৮১২৭৯৮
B-SCAN